ইসলাম কি ও কেন

[ঐতিহাসিক উর্দূ গ্রন্থ : ইসলাম ক্যায়া হায় -এর সংশোধিত সংযোজিত নতুন সংস্করণের অনুবাদ]

মূল

মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নো'মানী রহ.

জগত বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, বহু কালজয়ী গ্রন্থ প্রণেতা

মাসিক আলফুরকান (উর্দূ, লাক্ষ্ণৌ)- এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ মাহদী হাসান

আলেম, লেখক ও অনুবাদক

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)

১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ধরা যাক, আল্লাহ তাআলা যদি কিছুক্ষণের জন্য আমাদের এ দুনিয়ায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়ে দেন, আর তিনি এসে বর্তমান দুনিয়ায় বসবাসরত উম্মতের জীবন-যাপন পদ্ধতি দেখেন, তবে তাঁর দিলে কেমন ব্যথা লাগবে? আল্লাহ তাআলার যেসব বান্দাদের এখনো প্রিয়নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনিত ধর্মের সাথে একটু সম্পর্ক আছে, যাদের অন্তরে দ্বীনের প্রতি দরদ ও তার ফিকির রয়েছে, তাদের প্রতি নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পয়গাম ও নির্দেশ কী হবে?

অধমের এ ব্যাপারে একটুও সন্দেহ নেই যে, নামে মুসলমান জাতির অধিকাংশের বর্তমান ইসলাম-বিবর্জিত জীবন এবং সীমাহীন বদদ্বীনী ও গুনাহবহুল অবস্থা দেখে তাঁর অন্তর যারপরনাই ব্যথিত হবে। যে ব্যথা তায়েফে কাফের কর্তৃক পাথর নিক্ষেপ এবং উহুদ প্রান্তরে জালিম মুশরিক কর্তৃক রক্তাক্ত হামলার দরুন অনুভূত ব্যথার তুলনায় অনেক বেশি হবে। দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্যের সম্পর্ক এবং এর প্রতি দরদ ও ফিকিরধারী মুসলমানদের প্রতি প্রিয়নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পয়গাম থাকবে যে, আমার বিকৃত উম্মতের ধর্মীয় অবস্থার উন্নতির জন্য আর তাদের মধ্যে ঈমানী রূহ ও পূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করার জন্য তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাক। এতে কোন ধরনের অলসতা করো না।

অধমের এ অনুভূতি যদি আপনাদের অন্তর গ্রহণ করে নেয়, তাহলে এখনই ফয়সালা করে নিন এবং দৃঢ় সংকল্প করে নিন যে, সামনে থেকে এ গুরুদায়িত্ব পালনকে নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে ফেলবো। অধম অন্তরের পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আবেদন করছি যে, আজকাল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের আত্মাকে খুশী করার, শান্তি দেয়ার এবং তাঁর আত্মিক দুআ লাভের এটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি মাধ্যম।

বক্ষমান এ ছোট্ট পুস্তকটি এ অনুভূতিরই এক বহিঃপ্রকাশ। এটা এ জন্যই লেখা হয়েছে যে, অল্পপড়ুয়া সাধারণ নর-নারীরা নিজেরা পাঠ করবে, অন্যকে পাঠ করে শুনাবে, মসজিদ-মজলিসে সাধারণ মুসলমানদেরকে পড়ে শুনাবে, যাতে তারা অন্যের মাঝে ঈমানের রূহ এবং ইসলামী জীবন গঠনের চেষ্টা যার যার সাধ্য অনুযায়ী করতে পারে। আল্লাহকে সন্তুষ্টি অর্জনকারী, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মাকে আনন্দ দানকারী এ কাজে সবাই যেন যথাসাধ্য অংশ নিতে পারে।

আল্লাহ তাআলার তাওফীকে ছোট্ট এ কিতাবখানাতে দ্বীনের সারকথা এসে গিয়েছে। কুরআন-হাদীসের অতি জরুরী শিক্ষা বিশটি সবকে সাজিয়ে একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। যা অর্জন করে, যার উপর আমল করে একজন মানুষ শুধু ভালো মুসলমানই নয় বরং ইনশাআল্লাহ পরিপূর্ণ মুমিন ও ওলিআল্লাহও হয়ে যেতে পারবে। মুসলমান ছাড়াও এ কিতাবখানা ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী অমুসলিমদেরকেও দেয়া যেতে পারে। তারাও এথেকে আশাতীত উপকৃত হবে।

শুরুতে কিছু কিছু সবকে হাদীসসমূহের রেফারেন্স দেয়া হয়েছে, পরে আর এর প্রয়োজন মনে করিনি। কেননা সব হাদীসই 'মিশকাত শরীফ' থেকেই নেয়া হয়েছে। সুতরাং যেসব হাদীসের হাওয়ালা বা রেফারেন্স দেয়া হয়নি তার সবই 'মিশকাত শরীফ' থেকে নেয়া হয়েছে। কুরআন-হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে পাঠক সাধারণের সহজবোধ্যতার দিকে খেয়াল রেখে হুবহু অনুবাদ না করে মর্মার্থ উপস্থাপন করা হয়েছে।

যা কিছু হয়েছে আর যা কিছু হবে সবই মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়েছে এবং হবে। সুতরাং সমূহ প্রশংসা এবং সমূহ কৃতজ্ঞতার শুরু-শেষ তাঁর জন্যই নিবেদিত।

মুহাম্মাদ মনযূর নো'মানী

লক্ষ্ণৌ, ভারত

জুমাদাল উখরা ১৩৭৬ হিঃ

জানুয়ারী ১৯৫৭ ইং

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

সবক ঃ ১৯

সবক ঃ ২০

পরিশিষ্ট

।।।।।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রতিটি মুসলমানের জন্য ইসলামী জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা ও ফযীলত

এটাতো সবাই জানেন, ইসলাম কোন গোষ্ঠীগত বা বংশীয় উত্তরাধিকার নয় যে, মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই সে এমনিতেই মুসলমান হয়ে যাবে এবং মুসলমান হওয়ার জন্য তার কোন কিছু করা লাগবে না। যেমন শেখ বা সাইয়েদ বংশে জন্মগ্রহণ করলেই সন্তান এমনিতেই শেখ বা সাইয়েদ হয়ে যায়। শেখ বা সাইয়েদ হওয়ার জন্য তাকে কোন কিছু করতে হয় না, কিন্তু ইসলাম এমন একটি ধর্মের নাম, এমন একটি জীবন বিধানের নাম, যা আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছিলেন, যা কুরআনে কারীমে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, যে এই দ্বীন মেনে নিবে এবং সে অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করবে, সে-ই মূলত মুসলমান। যারা এই দ্বীন সম্পর্কে ধারণা রাখে না এবং সে অনুযায়ী জীবন গঠন করে না, সে খাঁটি মুসলমান নয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, খাঁটি মুসলমান হতে হলে দুটো বিষয় অত্যন্ত জরুরী—

১. আমরা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জানবো, কমপক্ষে প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়াবলীর জ্ঞান অর্জন করবো।

২. এই দ্বীনকে আমরা মানবো এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেব।

—এরই নাম ইসলাম এবং মুসলমান হওয়ার অর্থই হলো এটা।

ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা অর্থাৎ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ জানা, মুসলমান হওয়ার পূর্বশর্ত। এ জন্যই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থাৎ—'দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয।'

(ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের ধর্মে যেসব কাজ ফরয সেসব কাজ সম্পাদন করা—ইবাদত। এজন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা এবং ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করাও ইবাদত। এজন্য মহান আল্লাহ্ তাআলার দরবারে অনেক সওয়াব বা প্রতিদান রয়েছে। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজের অনেক ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। একখানা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

'যে ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করার জন্য ঘর থেকে বের হয়, সে ঘরে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকে।' (তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে এসেছে—

'যে ব্যক্তি ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন রাস্তায় পা বাড়ায়, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য বেহেশতের রাস্তা সুগম করে দেন।' (মুসলিম)

আরেকটি হাদীসে এসেছে—

'ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা করা পূর্ববর্তী গুনাহসমূহের কাফফারা স্বরূপ।' (তিরমিযী)

(অর্থাৎ এ দ্বারা মানুষের পেছনের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।)

মোটকথা, প্রয়োজনীয় ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা, ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলীর ধারণা লাভ করার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। সে ধনী হোক বা গরীব, যুবক হোক বা বৃদ্ধ, শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত, পুরুষ হোক বা নারী। পূর্বে বর্ণিত হাদীস থেকে এটা বুঝা গেল যে, জ্ঞানার্জনের কাজে যে সময়টুকু অতিবাহিত হয়, এর জন্য যে পরিশ্রমটুকু করতে হয়, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এর বিরাট প্রতিদান আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সুতরাং আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে, ইসলামের খুব জরুরী বিষয়গুলোর জ্ঞান অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাবো।

যেসব মুসলিম ভাইয়েরা বয়স বেড়ে যাওয়ার দরুন বা কাজ-কর্মের ব্যস্ততার কারণে কোন মাদরাসায় ভর্তি হয়ে নিয়মতান্ত্রিক ছাত্র হিসেবে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের সুযোগ হারিয়ে ফেলেছেন ; তাদের জন্য সহজ পথ হলো—যাঁরা পড়াশোনা জানেন, তাঁরা ধর্মীয় নির্ভরযোগ্য বই-পুস্তকের সহায়তায় এ পথে অগ্রসর হবেন। আর যাঁরা পড়ালেখা জানেন না বা জানলেও খুবই মামুলী, তারা ভালো পড়াশোনা জানেন এমন কারো মাধ্যমে পাঠ করিয়ে ধারাবাহিকভাবে শুনবেন। যদি ঘরে-বাইরে, মজলিসে-বৈঠকে এবং মসজিদসমূহে এভাবে কিতাব পড়াশোনার রীতি প্রচলিত হয়ে যায়, তবেই সব শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞান প্রসার লাভ করবে।

এ ছোট্ট কিতাবখানা এ উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়েছে। এতে দ্বীনী সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী ও সব মুসলমানের জানা জরুরী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন সব হিদায়াত সমৃদ্ধ বাণী বা হাদীসসমূহ খুব সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

আসুন! এসব বিষয়গুলো আমরা নিজেরা শিখি, অন্যদেরকে শিখাই। এসব ইসলামী সভ্যতা প্রচলনে এবং সর্বত্র প্রসার ঘটাতে আমরা আমাদের চেষ্টা-তদবীর কাজে লাগাই। একে জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

> 'যে ব্যক্তি ইসলামকে জিন্দা করার নিয়তে দ্বীন শেখার চেষ্টা করে, (অর্থাৎ অন্যদের মাঝে প্রচার-প্রসার করে এবং সে অনুযায়ী তাদেরকে পরিচালনা করে) আর তখন যদি সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে কিয়ামতের দিন নবী-রাসূলদের এতো নিকটবর্তী থাকবে যে, তার মাঝে ও নবীদের মাঝে একটি মাত্র শ্রেণীর পার্থক্য থাকবে।'

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন যেন আমরা নিজেরা দ্বীন শিখতে পারি, অন্যদেরকে শিখাতে পারি, নিজেরা দ্বীন অনুযায়ী চলতে পারি এবং আল্লাহর অন্য সব বান্দাদেরকেও সে পথে পরিচালিত করতে নিজেদের শ্রম ও মেধা কাজে লাগাতে পারি।

সবক ঃ ১

কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ ঃ 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই (অর্থাৎ উপাসনা বা ইবাদত–বন্দেগীর উপযুক্ত কেউ নেই) আর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রেরিত রাসূল।'

এ 'কালিমা–এ–তাইয়্যিবাহ'–টাই ইসলামের প্রবেশদ্বার। ঈমান ইসলামের বিশাল বৃক্ষের শেকড় এবং আকাশছোঁয়া ভবনের মূলভিত্তি। এটাকে গ্রহণ করে এবং দৃঢ় বিশ্বাসে পাঠ করে পুরো জীবনের কাফির–মুশরিকও মুমিন–মুসলমান এবং মুক্তি ও সফলতার যোগ্য বনে যায়। কিন্তু শর্ত হলো, এই কালিমাতে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ বা একত্ববাদ এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত–রিসালাতের যে স্বীকারোক্তি রয়েছে, এটাকে বুঝে–শুনে মানতে হবে ও গ্রহণ করতে হবে। যদি কেউ 'একত্ববাদ' ও 'রিসালাত'–কে না বুঝে এর মানে–মতলব অনুধাবন না করে শুধু গড়গড় করে মৌখিক পাঠ করে নেয়, তবে সে আল্লাহ তাআলার কাছে মুমিন–মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না। সুতরাং পূর্বশর্ত হলো, আমাদেরকে প্রথমে এই পবিত্র কালিমার অন্তর্নিহিত মর্মবাণী বুঝার চেষ্টা করা।

পবিত্র কালিমাটির দুটো অংশ রয়েছে।

কালিমার প্রথম অংশে

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ (উপাস্য) নেই।'

এতে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ বা তাওহীদের স্বীকারোক্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া এমন আর কোন সত্তা নেই, যিনি ইবাদত বা উপাসনা, বন্দেগী বা দাসত্ব পাওয়ার যোগ্য। কেননা তিনিই আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু। তিনিই প্রতিপালক,

তিনিই জীবিকা দানকারী। তিনিই মৃত্যুদাতা, তিনিই জীবনদাতা। সুস্থতা-অসুস্থতা, দারিদ্র-সচ্ছলতা, ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ সবকিছু একমাত্র তাঁরই ক্ষমতার কব্জায়। আসমান-যমীনে তিনি ছাড়া সবাই—চাই সে মানুষ হোক বা ফেরেশতা—তাঁরই সৃষ্টজীব এবং তাঁরই গোলাম। তাঁর সৃষ্টিকাজে তার সাথে কোন সাহায্যকারী ও অংশীদার নেই। তাঁর নির্দেশাবলীকে ওলট-পালট করে দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। না তাঁর কাজে নাক গলানোর স্পর্ধাও কারো আছে। সুতরাং তিনি তো তিনিই, যাকেই কেবল ইবাদত করা যায়। তাঁর সাথেই সম্পর্ক জুড়া যায়। দুঃখ-দুর্দশায় বা যে কোন প্রয়োজনে তাঁর কাছেই কেঁদে-কেঁদে হাত পাতা যায়। বুকভরা আশা নিয়ে ভিক্ষুক বেশে চাওয়া যায়। তিনি তো রাজাধিরাজ। অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ সত্তা। তিনি সব বাদশাহ্দের বাদশাহ। দুনিয়ার সব বিচারকদের উর্ধ্বে মহাবিচারপতি। সুতরাং এমন সত্তারই নির্দেশাবলী মেনে চলা জরুরী। পূর্ণ আনুগত্যের সাথে তাঁর নির্দেশের অনুকরণ করা উচিত। তাঁর নির্দেশাবলীর বিপরীত অন্য কারো আইন কখনো মেনে নেয়া যায় না। চাই তিনি রাষ্ট্রপতি হোন বা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি হোন, যদিও তিনি পিতা হোন বা বংশের চৌধুরী হোন, চাই তিনি কোন প্রিয়তম বন্ধু হোন অথবা হোক না তা নিজ প্রবৃত্তির একান্ত চাহিদা।

মোটকথা, আমরা যখন জেনে-শুনে মেনে নিয়েছি যে, এক আল্লাহ তাআলাই ইবাদত-বন্দেগীর উপযুক্ত, আমরা শুধুমাত্র তাঁরই গোলাম। সুতরাং আমাদের আমল বা কাজ-কর্মও সে মোতাবেক হওয়া উচিত। দুনিয়াবাসীরা আমাদেরকে দেখেই যেন বুঝে ফেলে যে, এরা শুধু আল্লাহরই গোলাম। এরা শুধু আল্লাহর আইনই মেনে চলে। আল্লাহর জন্যই বেঁচে থাকে। আল্লাহর জন্যই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। অর্থাৎ—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ —হোক, আমাদের শপথ ও ঘোষণা।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ —হোক, আমাদের বিশ্বাস ও ঈমান।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ —হোক, আমাদের কর্মোদ্দীপনা ও মর্যাদা।

এই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বীনী ভিত্তিমূলের প্রথম ইট। সকল নবীর

(আঃ) সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ সবক। দ্বীনের সব বিষয়ে এর মর্যাদা সর্বোচ্চে। প্রিয়নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিখ্যাত হাদীস—তিনি ইরশাদ করেন—

"ঈমানের সত্তরোর্ধ শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও উন্নত শাখা হলো—'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর স্বীকারোক্তি।"
(বুখারী, মুসলিম)

এ জন্যই তো যিকিরসমূহের মধ্যে উত্তম হলো—'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র যিকির। যেমন অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

'যিকিরসমূহের মধ্যে উত্তম ও উন্নত যিকির হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর যিকির।' (ইবনে মাজাহ, নাসাঈ)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা হযরত মূসার (আঃ) এক প্রশ্নের জবাবে ইরশাদ করেন—

'হে মূসা ! যদি সাত আকাশ ও সাত যমীন এবং তৎমধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবকিছুকে এক পাল্লায় রাখা হয় আর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অন্য পাল্লায়, তবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পাল্লাই ভারি প্রমাণিত হবে।' (শরহুসসুন্নাহ)

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মর্যাদা ও ফযীলত এজন্য যে, এতে রয়েছে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ বা একত্ববাদের শপথ এবং স্বীকারোক্তি, শুধু তারই ইবাদত-বন্দেগী করার, তারই বিধান মেনে চলার, তাকেই নিজের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য নির্ধারণ করার এবং একমাত্র তার সাথেই সম্পর্ক জুড়ার অঙ্গীকার ও সিদ্ধান্ত এতে ফুটে উঠেছে। এটাই ঈমান ও ইসলামের রূহ। এজন্যই নবীজী মুসলমানদেরকে নির্দেশ করেছেন যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কালিমা শরীফ বেশি বেশি পড়ে নিজেদের ঈমান তাজা কর। বিখ্যাত একটি হাদীস, একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'লোকসকল ! নিজেদের ঈমান তাজা করতে থাক।'—কোন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন—হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা কিভাবে আমাদের ঈমান তাজা করবো?' প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম জবাবে ইরশাদ করেন—'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বেশি করে পাঠ কর।' (মুসনাদে আহমাদ, জামউল ফাওয়াইদ)

'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠে ঈমান তাজা হয়, কেননা এতে আল্লাহর তাওহীদ অর্থাৎ শুধু তাঁরই ইবাদাত–উপাসনা, একমাত্র তাঁরই প্রেম–ভালোবাসা এবং একমাত্র তাঁরই আনুগত্যের শপথ ও স্বীকারোক্তি নিহিত রয়েছে। আর যেমন পূর্বে বলা হয়েছে যে, এটাই তো ঈমানের প্রাণ। সুতরাং যতই আমরা বুঝে–বুঝে এবং ধ্যানের সাথে এ কালিমা শরীফ পাঠ করবো, নিঃসন্দেহে ততই আমাদের ঈমান তাজা হবে, ততই আমাদের অঙ্গীকার পাকাপোক্ত হবে। ধীরে ধীরে ইনশাআল্লাহ এই 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আমাদের আমলে ও কাজে–কর্মে ফুটে উঠবে এবং আমাদের জীবন হয়ে উঠবে 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

আমাদের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত—আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী এই কালিমা শরীফকে ধ্যান ও একাগ্রতার সাথে মনোযোগ সহকারে বেশি বেশি পাঠ করবো। ফলে আমাদের ঈমান তাজা হতে থাকবে এবং সেই 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাঁচেই আমাদের জীবন গড়ে উঠবে। এতো হলো কালিমার প্রথম অংশ অর্থাৎ 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বয়ান।

কালিমার দ্বিতীয় অংশ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

'মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তাআলার রাসূল।'

এতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের স্বীকারোক্তি ও ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাসূল হওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিশ্বমানবতার হিদায়াত বা পথপ্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি এ দুনিয়ায় শুভাগমন করে আমাদেরকে যে পথনির্দেশ দিয়েছেন, যেসব সংবাদ প্রদান করেছেন, সবই সত্য ও সঠিক। যেমন কুরআনে কারীম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসা, ফেরেশতাদের সৃষ্টি, কিয়ামত

সংঘটিত হওয়া, কিয়ামতের পর মৃতদের জীবিত হওয়া এবং যার যার কৃতকর্মের ফলস্বরূপ বেহেশত বা দোযখ লাভ করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল হওয়ার অর্থ হলো, তিনি যা কিছু দুনিয়াবাসীকে জানিয়েছেন, সবই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সন্দেহমুক্ত জ্ঞান লাভ করার পরই বলেছেন। এর সবকিছুই সঠিক, নির্ভুল ও সত্য। তাতে কোন ধরনের কোন সন্দেহের অবকাশ মাত্রই নেই। তিনি বিশ্বের জনমণ্ডলীকে যে হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করেছেন, তাদের জন্য যেসব বিধান প্রবর্তন করেছেন, মূলত সে সবই মহান আল্লাহ তাআলার হিদায়াত ও বিধান। তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে।

এ দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন সত্তাকে রাসূল হিসেবে মেনে নিলে, আপনা-আপনি এটা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যায় যে, তাঁর সমূহ পথনির্দেশ বা হিদায়াত এবং আদেশ-নিষেধ পরিপূর্ণভাবে মেনে চলতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা কাউকে এ জন্যই রাসূল মনোনীত করে প্রেরণ করেন যেন তাঁর বান্দাদের প্রতি তাঁর পছন্দনীয় বিধি-বিধান পৌঁছে দিতে পারেন।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ—

'আর আমি প্রত্যেক রাসূলকে এজন্যই প্রেরণ করেছি যেন আমার হুকুমে তাদের অনুকরণ করা হয়।' (অর্থাৎ তাদের আদেশ মান্য করা হয়)

রাসূলের প্রতি ঈমান আনা, তাঁকে রাসূল হিসেবে মেনে নেয়ার অর্থই হলো, তাঁর সব কথা সত্য বলে বিশ্বাস করা, তাঁর শিক্ষা ও হিদায়াতকে আল্লাহর শিক্ষা ও হিদায়াত মনে করা। তাঁর আদেশ মোতাবেক চলার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া। অতঃপর যদি কেউ কালিমাতো পড়েছে কিন্তু নিজের ব্যাপারে সে এ সিদ্ধান্ত নেয়নি যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথই সত্য পথ এবং এর বিপরীত সবই ভুল ও ভ্রান্ত বলেই মনে করবো, তাঁর রেখে যাওয়া শরীয়ত ও তার বিধি-বিধান

এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবো—তবে সে ব্যক্তি মূলত মুমিন বা মুসলমানই নয় ; হয়তো সে মুসলমান হওয়ার অর্থই উপলব্ধি করতে পারেনি।

স্পষ্ট কথা হলো—যখন আমরা কালিমা পড়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য রাসূল বলে মেনে নিয়েছি তখন আমাদের জন্য তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে গেছে। এখন তাঁর সব কথাই আমাদেরকে মানতে হবে। তাঁর রেখে যাওয়া শরীয়তের উপর পুরোপুরি আমল করতে হবে।

কালিমা শরীফ মূলত একটি অঙ্গীকার, একটি স্বীকারোক্তি। কালিমার দুটো অংশের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যে আলোচনা উপরে বর্ণিত হয়েছে, এ থেকে হয়তো বুঝা গেছে যে, এই কালিমা আসলেই একটি শপথ এবং একটি অঙ্গীকারনামা। তা হলো—আমি শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই সত্য ইলাহ, একমাত্র মাবুদ ও একমাত্র মুনিব হিসেবে মানি। ইহ-পরকালের সমূহ কার্যাবলীর চাবিকাঠি একমাত্র তাঁর হাতেই জানি। সুতরাং আমি তাঁরই এবং শুধু তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করব। গোলামকে যেভাবে তার মালিকের কথামতো চলতে হয়, ঠিক সেভাবেই আমি আমার আল্লাহর হুকুম মোতাবেক চলবো। তাঁকে সবচাইতে বেশী ভালবাসবো। তাঁরই সাথে গড়ে তুলব গোলামীর সম্পর্ক। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি আল্লাহ তাআলার সত্যনবী মেনে নিয়েছি। সুতরাং একজন উম্মতের মতো আমি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবো। তাঁর নিয়ে আসা শরীয়তের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুকরণ করবো। মূলত এই অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তির নামই হলো ঈমান। তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়ার উদ্দেশ্য ও সারকথাও এটাই।

অতএব কালিমা পাঠকারী প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, সে যেন নিজেকে সবসময় এ কালিমার অনুসারী মনে করে। এর মূলনীতির ভিত্তিতেই নিজের জীবন পরিচালনা করে। ফলে সে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে সত্যিকার একজন মুমিন মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হয় এবং নাজাত ও বেহেশতের অধিকারপ্রাপ্ত হয়। এমন সৌভাগ্যবানদের জন্য অনেক আকর্ষণীয় সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। হযরত আনাস (রাযি:)

থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মায়াজ (রাযি:)কে ইরশাদ করেন—

'যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'–এর সাক্ষ্য প্রদান করবে, এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা দোযখের আগুন হারাম করে দিয়েছেন।'

(বুখারী, মুসলিম)

আসুন! আমরা 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'–এর তাৎপর্য ও মর্যাদা উপলব্ধি করে একান্ত মনে তার সাক্ষ্য প্রদান করি। দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করি যে, আমার জীবনে কালিমার ঐ শপথই বাস্তবায়ন করবো। ফলে আমাদের অঙ্গীকার মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে না। কেননা আমাদের সামগ্রিক সফলতা ও মুক্তি এবং আমাদের ঈমান–ইসলামের ভিত্তিই হলো—এই কালিমা।

'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র প্রতি আমাদের পাকা ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপিত হোক। 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হোক আমাদের শপথ ও উদাত্ত ঘোষণা। হোক আমাদের জীবনের মূলনীতি। সর্বোপরি এই কালিমাই হোক বিশ্বমানবতার প্রতি আমাদের পয়গাম ও অনন্য তোহফা।

সবক ঃ ২

নামায

নামাযের গুরুত্ব ও তার প্রভাব

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এবং তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকারোক্তির পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে বড় ফরয হলো—নামায। নামায আল্লাহ তাআলার বিশেষ একটি ইবাদত। যা দিনে পাঁচবার ফরয করা হয়েছে। কুরআন মজীদের অর্ধ শতাধিক আয়াতে এবং শত শত হাদীসে নামাযের ব্যাপারে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং নামাযকে ইসলামের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি বলে অভিহিত করা হয়েছে।

নামাযের একটি বিশেষ প্রভাব হলো, যদি তা সঠিক পন্থায় আদায় করা যায়, আল্লাহ তাআলাকে হাজির-নাজির ভেবে একান্ত মনে খুশু-খুযূ সহকারে যদি তা আদায় করা হয়, তবে মানুষের অন্তর পরিস্কার হয়ে যায়। নামায ব্যক্তির জীবনকে সুন্দর করে দেয়। সমূহ পাপ-পঙ্কিলতা থেকে নামাযী মুক্তি পেয়ে যায়। সত্য ও সৎকাজের প্রতি আকর্ষণ এবং অন্তরে আল্লাহভীতি জন্ম নেয়। এ জন্যই ইসলামে অন্যসব ইবাদতের তুলনায় নামাযকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্তুর ছিল, কোন লোক তাঁর কাছে এসে ইসলাম কবুল করলে তিনি তাওহীদের তালীম দিয়েই সর্বাগ্রে নামাযের ব্যাপারে অঙ্গীকার নিতেন। মোটকথা ইসলামে কালেমার পরই নামাযের স্থান।

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দৃষ্টিতে নামাযী ও বে-নামাযী

হাদীসে রাসূল থেকে জানা যায় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায ছেড়ে দেয়াকে কুফুরী কাজ এবং কাফেরদের সংস্কৃতি আখ্যা দিতেন। তিনি বলতেন, যারা নামায পড়ে না ইসলামে তাদের কোন অংশ নেই। যেমন সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, প্রিয়নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'বান্দা এবং কুফুরের মাঝে পার্থক্যকারী হলো নামায ছেড়ে দেওয়া।'

(মুসলিম)

অর্থাৎ বান্দা যদি নামায ছেড়ে দেয়, তবে সে যেন কুফুরীর সাথে মিলে গেল। তার এই কাজ কাফেরদের কাজের মতই হল। কাফের নামায পড়ে না। সুতরাং যে মুসলমান নামায পড়ে না, সে তো কাফেরের মতই নামায ছেড়ে দিল।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

'যে ব্যক্তি নামায পড়ে না, ইসলামে তার কোনই অংশ নেই।'

(মুসনাদে বায্যার)

নামায কত বড় মর্যাদাপূর্ণ আমল! নামায পড়া কত সৌভাগ্যের বিষয়! নামায ছেড়ে দেয়া কত মারাত্মক ধ্বংস ও কত দুর্ভাগ্যের কথা! আরো একটি হাদীস থেকে তা অনুমান করা যায়। একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে ইরশাদ করেন—

'যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করবে, কিয়ামতের দিন সেই নামায তাঁর জন্য একটি নূর (আলো) হবে। তার জন্য (তার ঈমান-ইসলামের) প্রমাণ হবে এবং মুক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর যে ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে এবং সদা-সর্বদা নামায আদায় করবে না, তার জন্য তার নামায নূরও হবে না, প্রমাণও হবে না এবং শাস্তি থেকে মুক্তির কারণও হবে না। আর সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কারুন, ফেরাউন, হামান এবং উবাই ইবনে খাল্‌ফের সাথে থাকবে।'

(মুসনাদে আহমাদ)

প্রিয় পাঠক! আমাদের সবাইকেই চিন্তা করা উচিত যে, আমরা যদি সদা-সর্বদা এবং মনোযোগ সহকারে নামায না পড়ি এবং এর অভ্যাস গড়ে না তুলি, তবে আমাদেরকে পরকালে কী পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে!

হাশরের ময়দানে নামায ত্যাগকারীদের অপমান

কিয়ামতের দিন যে ভীষণ অপমান নামায ত্যাগকারীদের মাথা পেতে নিতে হবে, তা কুরআন মজীদের একটি আয়াতে এভাবে ইরশাদ হয়েছে—

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ. خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَ هُمْ سَالِمُوْنَ- سوره قلم

এ আয়াতের সারমর্ম হলো, কিয়ামতের দিন (যখন ভীষণ কঠিন সময় হবে, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জন্মলাভকারী সব মানুষ সেখানে একত্রিত হবে) আল্লাহ তাআলার বিশেষ এক দীপ্তিময় বড়ত্বের প্রতাপ প্রকাশিত হবে। তখন ঘোষণা করা হবে, সবাই মহান আল্লাহ তাআলার সামনে সিজদাবনত হও। ঐসব সৌভাগ্যবান ঈমানদার যারা দুনিয়াতে নামায পড়তো, তারা সাথে সাথে সিজদায় পড়ে যাবে। কিন্তু যারা দুনিয়াতে সুস্থ-সবল থাকা সত্ত্বেও নামায পড়তো না, তাদের কোমর তখন তক্তার মতো শক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা কাফেরদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকবে। সিজদা করতে পারবে না। তাদের প্রতি ভীষণ অপমান ও লাঞ্ছনার শাস্তি ছেয়ে যাবে। দৃষ্টি অবনমিত হয়ে যাবে। চোখ তুলে কিছু দেখতেও পারবে না। দোযখের শাস্তির পূর্বে লাঞ্ছনার এই শাস্তি হাশরের ময়দানে তাদেরকে ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এ শাস্তি থেকে যেন পরিত্রাণ দান করেন।

মূলত নামায ত্যাগকারী ব্যক্তি এক হিসেবে খোদাদ্রোহী। সুতরাং সে যতই অপমানিত হোক, যতই লাঞ্ছনা ভোগ করুক আর যত শাস্তিই তাকে দেয়া হোক না কেন, নিশ্চয় এটা তার প্রাপ্য। সে এর উপযুক্ত। উম্মতের কোন কোন ইমামের মতে নামায ত্যাগকারী ব্যক্তি ধর্মত্যাগী এবং মুরতাদদের মতো হত্যা করে দেয়ার উপযুক্ত।

প্রিয় পাঠক! আমাদেরকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, নামায ছাড়া ইসলামের দাবী করা অনর্থক ও ভিত্তিহীন। নামায পড়াই ঐ বিশেষ ইসলামী আমল যা আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদের সম্পর্ক গড়ে তোলে। আর আমাদেরকে তার রহমত ও দয়াপ্রাপ্তির উপযুক্ত বানিয়ে দেয়।

নামাযের বরকত

• যে বান্দা পাঁচবার আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হয়ে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে যায়, তাঁর গুণগান ও হামদ–সানা করে, তাঁর সান্নিধ্যে নত হয়, সিজদায় শির লুটিয়ে দেয়, তাঁর কাছে চায়, দুআ করে, সে বান্দা আল্লাহ তাআলার বিশেষ ভালোবাসা–মহাব্বত, রহমত ও দয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের বদৌলতে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তাঁর অন্তর জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। জীবনটা পাপের কালিমা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। একটি হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার খুব চমৎকার এক উদাহরণ দিয়ে ইরশাদ করেন—

> 'বলতো! যদি তোমাদের কারো বাড়ীর আঙ্গিনায় একটি নদী প্রবাহিত হয় আর সে ঐ নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তবে কি তার শরীরে কোন ধরনের ময়লা অবশিষ্ট থাকবে? সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) বললেন ঃ হুযূর! কোন ময়লাই থাকবে না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—দেখ! পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও এমনই। আল্লাহ তাআলা এর বরকতে গুনাহ ও পাপসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেন।'
>
> (বুখারী, মুসলিম)

জামাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, নামাযের আসল ফযীলত ও বরকত এবং পুরস্কার ও মহিমা লাভ করতে হলে জামাতের সাথে নামায পড়ার শর্তারোপ করা হয়েছে। জামাতকে এত ভীষণ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, যারা অলসতাবশত নামাযের জন্য জামাতে উপস্থিত হয় না, তাদের সম্পর্কে প্রিয়নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ইরশাদ করেন—

'আমার মন চায় যে, আমি তাদের ঘরবাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিই, যারা জামাতে উপস্থিত হয় না।' (মুসলিম)

শুধু এই একটি হাদীস দ্বারাই অনুমান করা যায় যে, জামাত ত্যাগ করা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কি পরিমাণ নিন্দনীয়।

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—

'জামাতের সাথে নামায পড়ার সওয়াব একা পড়ার সওয়াবের সাতাশ গুণ বেশী হবে।' (বুখারী, মুসলিম)

(জামাতের এই গুরুত্ব শুধু পুরুষদের জন্য। হাদীসে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, মহিলারা মসজিদের তুলনায় ঘরে নামায পড়লে বেশী সওয়াব পাবে।)

ধারাবাহিকতা বজায় রেখে জামাতে নামায পড়ার ফলে পরকালীন পুরস্কার ছাড়াও পার্থিব অনেক উপকার লাভ করা যায়। যেমন ঃ ধারাবাহিকভাবে জামাতে নামায আদায় করতে থাকলে মানুষ সময়ানুবর্তিতার গুণ লাভ করে। প্রতিদিন পাঁচবার মহল্লার সব মুসলমান ভাইদের সাথে দেখা-সাক্ষাত হয়। একত্রিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যার মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করা যেতে পারে। জামাতের দৃঢ়তার ফলে নামাযের পরিপূর্ণ দৃঢ়তা অর্জিত হয়। যারা জামাতের গুরুত্ব দেয় না, সবসময় জামাতের সাথে নামায আদায় করে না, প্রায়শ দেখা যায়, তাদের নামায কাযা হয়ে যাচ্ছে। আরেকটি বড় উপকার হলো, জামাতের সাথে নামায আদায়কারী প্রত্যেকের নামায জামাতের নামাযের একটি অংশে পরিণত হয়ে যায়। সেখানে আল্লাহর এমন নেককার ও সৎ বান্দাগণও উপস্থিত থাকেন, যাদের নামায খুবই খুশু-খুযু (বিনয় ও আন্তরিকতা) সমৃদ্ধ। আল্লাহ তাআলা তাদের নামায কবুল করেন। মহান আল্লাহ তাআলার 'মেহেরবান' গুণের প্রতি আমরা আশান্বিত যে, তিনি যখন জামাতের কিছুসংখ্যক বান্দার নামায কবুল করবেন, তখন তাদের সাথে নামায আদায়কারী অন্য বান্দাদের নামাযও কবুল করে নিবেন। যদিও তাদের নামায নেককারদের মতো না-ও হয়।

ফারসী কবির ভাষায়—

'সৎলোকের সাহচর্যের দরুন আল্লাহ তাআলা পাপীদেরও ক্ষমা করে দেন।'

সুতরাং আমাদের সকলের ভেবে দেখা উচিত, মারাত্মক কোন ওজর-আপত্তি ছাড়া জামাত ত্যাগ করা, কত বড় প্রতিদান ও কত বরকত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার নামান্তর।

'খুশু'-'খুযু'র গুরুত্ব

খুশু-খুযুর সাথে নামায পড়ার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা 'হাযির-নাযির' মনে করে নামায এমনভাবে পড়া হবে যে, অন্তর তাঁরই ভালবাসায় ভরপুর হবে, তাঁর ভয়, তার বড়ত্ব ও মহত্বের অনুভূতি জাগরুক থাকবে। কোন অপরাধী বড় কোন রাজা-বাদশাহ বা বিচারকের সামনে দণ্ডায়মান হলে যেমন হয়। নামাযের জন্য দাঁড়িয়েই খেয়াল করবে যে, আমি আমার মহান আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত। তাঁর বড়ত্ব প্রকাশের জন্য দাঁড়িয়েছি। রুকু করার সময় মনে করবে, আমি তাঁরই সামনে নত হচ্ছি। সিজদা করার সময় মনে করবে, আমি তাঁর সামনেই সিজদা করছি এবং তাঁর কাছে নিজের অপারগতা ও তুচ্ছতা প্রকাশ করছি।

আরো উত্তম হলো, দাঁড়ানো অবস্থায়, রুকু-সিজদায় গিয়ে যাই পাঠ করবে, তা বুঝে-বুঝে পাঠ করবে। আসলে নামাযের মজা তখনই অনুভূত হবে, যখন নামাযী তার নামাযে পাঠকৃত বিষয়গুলোর মানে-মতলব বুঝে পাঠ করবে। (নামাযে যা কিছু পাঠ করা হয়, সেগুলোর অর্থ মুখস্থ করে নেয়া খুব সহজ একটা কাজ।)

নামাযে খুশু-খুযু অর্থাৎ অন্তরকে আল্লাহ তাআলার দিকে ঝুকিয়ে দেয়া নামাযের মূল প্রাণ। এটাই নামাযের মূলকথা। আল্লাহর যে বান্দা এভাবে নামায পড়বে, তার মুক্তি ও সফলতা, নাজাত ও কামিয়াবী অবধারিত।

কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলার ইরশাদ—

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ

অর্থাৎ, 'ঐসব ঈমানদারেরাই সফল হবে, যারা তাদের নামায খুশুর সাথে আদায় করে।' (সূরা মুমিনুন : ১-২)

একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'আল্লাহ তাআলা পাঁচটি নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি এ নামাযের জন্য ভালভাবে উযূ করল, সঠিক সময়ে তা আদায় করল, রুকু-সিজদা যেমন করা দরকার তেমনি করল এবং খুব খুশুর সাথে তা আদায় করল, এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর যে এমন করল না (অর্থাৎ এমন উত্তম পন্থায় নামায পড়ল না) তার জন্য আল্লাহর কোন ওয়াদাই নেই। আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন, চাইলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন।'

(মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ)

আমরা যদি চাই যে, পরকালীন শাস্তি থেকে মুক্তি পাই এবং যদি চাই যে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন, তবে আমাদেরকে উক্ত হাদীস শরীফের বর্ণনা মোতাবেক পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়ম থেকে উত্তম পন্থায় আদায় করা উচিত।

নামায পড়ার নিয়ম ঃ

নামাযের সময় হলেই প্রথমেই আমাদেরকে ভাল করে উযূ করে নেয়া উচিত। উযূর সময় মনে করবে যে, মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিতির জন্য এবং তার ইবাদত করার জন্য এই পবিত্রতা অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহ তাআলার অনেক বড় দয়া যে, তিনি উযূর মধ্যেও আমাদের জন্য অনেক বরকত ও রহমত নিহিত রেখেছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে—

'উযূতে শরীরের যে অঙ্গগুলো ধৌত করা হয়, ঐসব অঙ্গের মাধ্যমে কৃত গুনাহগুলো উযূর বরকতে মাফ হয়ে যায়। ঐসব

গুনাহের অপবিত্র প্রভাব যেন উযূর পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়।'

উযূর পর যখন আমরা নামাযের জন্য দাঁড়াতে যাব, তখন আমাদের অন্তরে এই খেয়াল জমানো উচিত যে, আমরা গুনাহগার ও নিতান্ত পাপী বান্দা, আমাদের ঐ মহান প্রভু ও মাবুদের সামনে দণ্ডায়মান হতে যাচ্ছি, যিনি আমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয়, স্পষ্ট ও লুকানো সবকিছুই জানেন। কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তাঁর সামনে উপস্থিত হতে হবে।

অতঃপর যে ওয়াক্তের নামায পড়ব, সে ওয়াক্তের বিশেষ নিয়ত করে নিয়মমাফিক কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে মনে প্রাণে বলব—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

[আল্লাহ সবচেয়ে বড়।]

অতঃপর হাত বেঁধে এবং আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হওয়ার ধ্যান করে পাঠ করব—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

'হে আমার আল্লাহ! তোমার সত্তা পবিত্র। আর তোমার জন্যই সমূহ প্রশংসা। আর তোমার নাম অত্যন্ত বরকতময়। তোমার মর্যাদা খুবই উন্নত। আর তুমি ছাড়া কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই।'

অতঃপর পড়বে—

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

(আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(আমি আল্লাহ তাআলার নামে শুরু করছি যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু।)

ও পের সূরা ফাতেহা পা করবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ
(امين)

'সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক পরম করুণাময় ও অতীব দয়ালু। কিয়ামত দিবসের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত কর। সেসব সৎকর্মশীলদের রাস্তায়, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ। তাদের রাস্তায় নয় যাদের প্রতি তোমার গজব পতিত হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট। আমীন (হে আল্লাহ তুমি কবুল কর)'

এরপর কোন একটি সূরা বা সূরার অংশ পাঠ করবে। এখানে ছোট ছোট কয়েকটি সূরা অর্থসহ সন্নিবেশিত হল—

وَالْعَصْرِ. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

সূরা ঃ 'সময়ের কসম! সমগ্র মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। (এবং তাদের পরিণতি খুবই খারাপ) কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করে, এবং একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং একে অপরকে (অসত্য থেকে বেঁচে থাকার কষ্টে) সবর করার উপদেশ দেয়।'

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ
كُفُوًا اَحَدٌ.

সূরা ঃ 'বল! (হে নবী) আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। (তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সবাই তার মুখাপেক্ষী) তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন। আর তাঁর কোন সমকক্ষ নেই।'

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

সূরা ঃ 'বল! আমি প্রভাতালোকের প্রভুর আশ্রয় চাই। তার সব সৃষ্টির অনিষ্টতা থেকে এবং অন্ধকারের অনিষ্টতা থেকে যখন তা লুকিয়ে যায় এবং গিরোতে ফুঁকদানকারিণীর অনিষ্টতা থেকে (অর্থাৎ যাদুকারিণী মহিলার অনিষ্টতা থেকে) এবং বিদ্বেষ পোষণকারীর অনিষ্টতা থেকে, যখন সে বিদ্বেষ করে।'

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلٰهِ النَّاسِ. مِنْ شَرِّ الْوَاسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُوْرِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

সূরা ঃ 'বল! আমি সব মানুষের প্রতিপালকের আশ্রয় চাচ্ছি। সবার বাদশাহর সবার মাবুদের (উপাস্য)। যে কুমন্ত্রণা দেয় ও অত্মগোপন করে, তার অনিষ্টতা থেকে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। জ্বিনের মধ্য থেকে বা মানুষের মধ্য থেকে।'

মোটকথা, 'আলহামদু' সূরার পর কুরআন শরীফের কোন সূরা বা তার অংশবিশেষ পাঠ করতে হবে। প্রত্যেক নামাযে কুরআন মজীদ থেকে এ পরিমাণ কেরাত পাঠ করা জরুরী। সূরা পাঠ করে মহান আল্লাহ তাআলার মহত্ব, বড়ত্ব এবং মর্যাদার ধ্যান করে কায়মনোবাক্যে 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকুতে চলে যাবে। এবং কমপক্ষে তিন বার বলবে—

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

'আমার প্রতিপালক পবিত্র সত্তা, যিনি উন্নত মর্যাদার অধিকারী।'

যখন রুকুতে মহান আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা এবং বড়ত্ব প্রকাশের এ বাক্য পাঠ করবে তখন অন্তরেও তার পবিত্রতা ও বড়ত্বের পূর্ণ ধ্যান

আসা উচিত। অতঃপর রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলবে—

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

'আল্লাহ তাআলা তার বান্দার প্রশংসা শ্রবণ করেছেন।'

এরপর বলবে—

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

'হে আমাদের প্রতিপালক! সমূহ প্রশংসা একমাত্র তোমার।'

এরপর মনোযোগ সহকারে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে স্বীয় মহান রাব্বুল ইজ্জতের সামনে সিজদায় পড়ে যাবে। পর পর দুটো সিজদাহ করবে। সিজদায় গিয়ে মহান প্রভুর পূর্ণ ধ্যানে ডুবে যাবে। তাঁকে নিজের সামনে উপস্থিত মনে করে, তাঁকে দেখছি কল্পনা করে. তাঁকেই উদ্দেশ্য করে কায়মনোবাক্যে কমপক্ষে তিনবার বলবে—

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

'আমার প্রতিপালক অত্যন্ত পবিত্র যিনি অনেক উন্নত মর্যাদার অধিকারী।'

সিজদাহ অবস্থায় যে বাক্যটি পাঠ করবে, তখন অন্তরে নিজের বিনয়ভাব এবং দাসত্বের এবং মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অসীম বড়ত্বের পুরোপুরি ধ্যান ফুটিয়ে তুলবে। এই ধ্যান আর খেয়াল যত বেশী হবে, যত গভীর হবে, নামায তত উন্নত এবং মূল্যবান হবে। কেননা এটাই তো নামাযের আত্মা। এ পর্যন্ত শুধু এক রাকাতের বর্ণনা হল। অতঃপর যত রাকাত নামায পড়বে, এভাবেই পড়বে। তবে 'সানা' অর্থাৎ 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা শুধু প্রথম রাকাতের শুরুতেই পড়া হয়।

নামাযের শেষে এবং মাঝে যখন বসা হয় তখন ঐ বসা অবস্থায় اَلتَّحِيَّاتُ (আত্তাহিয়্যাতু) পাঠ করতে হয়। যা আসলে নামাযের সারাংশ এবং হিরকতুল্য অতি মূল্যবান অধ্যায়।

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِاللّٰهِ

اَلصّٰلِحِيْنَ. اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

'আদব ও সম্মানের সমূহ বাক্যাবলী [সকল মৌখিক ইবাদাত] একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য এবং সমূহ ইবাদত [সকল শারীরিক ইবাদাত] ও সাদকা [সকল আর্থিক ইবাদাত] একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। তোমার প্রতি সালাম হে নবী! আর আল্লাহর রহমত ও বরকত। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর সকল সৎকর্মশীল বান্দার প্রতি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসূল।'

তিন রাকাত ও চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে যখন দ্বিতীয় রাকাতে বসা হয় তখন শুধু এই 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়া হয়। আর শেষ বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যাতু'–এর পর দরূদ শরীফ এবং দুআয়ে মাসূরাও পড়া হয়।

দরূদ শরীফ—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

'হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি বিশেষ রহমত বর্ষণ করুন। যেভাবে আপনি ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি রহমত বর্ষণ করেছিলেন। নিশ্চয় আপনি অতিশয় প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।

হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি বরকত নাযিল করুন। যেভাবে

আপনি ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি বরকত নাযিল করেছিলেন। নিশ্চয় আপনি অতিশয় প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।'

এ দরূদ শরীফ মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্য (অর্থাৎ তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সাথে দ্বীনি সম্পর্কধারী ব্যক্তিবর্গের জন্য) রহমত ও বরকতের দুআ। আমরা যেহেতু এ অমূল্য দ্বীন ও সবচেয়ে দামী ইবাদাত নামায তাঁর মাধ্যমেই পেয়েছি এজন্য আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ই মহান অবদানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নামাযে এই দরূদ পাঠ করার হুকুম দিয়েছেন। যেন আমরা নামাযের শেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথে বিশেষ সম্পর্কধারীদের জন্য রহমত ও বরকতের দুআ করি।

অতএব আমাদের উচিত, প্রত্যেক নামাযের শেষ রাকাতে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবদানের কথা স্মরণ করে অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাঁর প্রতি এ দুটো দরূদ শরীফ পাঠ করি। তাঁর জন্য রহমত ও বরকতের দুআ করি।

দরূদ শরীফের পর নিজের জন্য এই দুআ করে সালাম ফেরাবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

'হে আমার আল্লাহ! আমি আমার জানের প্রতি বড়ই জুলুম করেছি, (আর তোমার আনুগত্য এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি হয়েছে) তুমি ছাড়া আমার গুনাহসমূহ ক্ষমাকারী আর কেউ তো নেই। সুতরাং তুমি তোমার নিজ দয়াগুণে আমাকে ক্ষমা করে দাও, আর আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয় তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।'

এই দুআতে নিজের গুনাহসমূহ ও ত্রুটিসমগ্রের স্বীকারোক্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আর মহান আল্লাহ তাআলার প্রতি ক্ষমা ও রহমতের আশা করা হয়েছে। মূলত বান্দার জন্য এটাই উচিত যে, সে নামাযের মত

মূল্যবান ইবাদতেও নিজের দোষ-ত্রুটির বিনয়াবনত স্বীকারোক্তি প্রকাশ করবে, নিজেকে গুনাহগার এবং ভুল-ভ্রান্তিতে ভরপুর এক তুচ্ছ গোলাম মনে করবে।

আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও তাঁর রহমতকেই একমাত্র সহায় ভাববে। ইবাদতের জন্য নিজের মধ্যে কোন গর্ব যেন জন্ম নিতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখবে। কেননা মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদত যেভাবে করা প্রয়োজন ঠিক সেভাবে আমরা কখনো ইবাদত করতে পারব না।

এখানে নামায সংক্রান্ত যা কিছু বর্ণনা করার ছিল, তা সবই বলা হয়েছে। পরিশেষে আবার বলছি, নামায এমন এক পরশমণি, এমন এক মহামহিম ইবাদাত, যদি একে খুব ধ্যান-খেয়ালের সাথে বুঝেশুনে কায়মনোবাক্যে (خشوع وخضوع সহ) সম্পাদন করা যায় (যেমন ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে) তবে এই নামায একজন মানুষকে ফেরেশতাসুলভ চরিত্রের অধিকারী বানিয়ে দিতে পারে। সুতরাং আমাদেরকে নামাযের মূল্য অনুধাবন করতে হবে।

উম্মত নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হবে কিনা, এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতোই চিন্তা ছিল যে, তিনি তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে, যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন, মুখ ফুটে কিছু বলাও যখন তাঁর জন্য কষ্টসাধ্য ছিল, তখনও তিনি উম্মতকে উদ্দেশ্য করে নামাযের ব্যাপারে দৃঢ় থাকতে এবং নামাযকে উত্তম পন্থায় আদায় করার অন্তিম উপদেশ করে গেছেন।

যেসব মুসলমান আজ নামায পড়ে না, নামায কায়েম করার এবং এর প্রচার প্রসারের জন্য কোনই চেষ্টা করে না, তাদের একটু ভাবা উচিত, মৃত্যু তো অবধারিত, কিয়ামতের দিন কিভাবে সেই দয়াল নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? কোন্ চোখে প্রিয়নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিকে তাকাবে? যেহেতু তারা মানবতার মুক্তিদূত মহান নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্তিম উপদেশের কোন মূল্য দিচ্ছে না।

আসুন ! আমরা ইবরাহীম (আঃ)এর ভাষায় দুআ করি—

رَبِّ اجْعَلْنِى مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِى. رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে এবং আমার বংশধরকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানিয়ে দাও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দুআকে কবুল কর। হে প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সব ঈমানদারদেরকে কিয়ামতের দিনের জন্য ক্ষমা করে দাও।'

নামাযের গুরুত্ব ও মর্যাদা, তার প্রভাব ও প্রতিফল বা বরকত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এবং প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহবায়ে কিরাম এবং আওলিয়া আল্লাহদের নামাযের অবস্থা অনুধাবন করে নিজের নামাযকে প্রাণবন্ত করার জন্য অধমের লিখিত গ্রন্থ 'নামায কি হাকিকত' (নামাযের স্বরূপ) অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

সবক ঃ ৩

যাকাত

ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলোর মধ্যে ঈমান ও নামাযের পরই যাকাতের স্থান। অর্থাৎ যাকাত হল ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ।

যাকাত হল, কোন মুসলমানের কাছে এক নির্ধারিত পরিমাণ ধনদৌলত থাকলে, সে প্রতি বছর হিসাব করে তাঁর ঐ সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ গরীব-মিসকিন বা অন্য যাকাতের হকদারদের জন্য ব্যয় করবে। এ নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ যার কাছে থাকবে তার উপর এ যাকাত ফরয।

যাকাত অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয ঃ

কুরআনে কারীমের জায়গায় জায়গায় নামাযের সাথে সাথে যাকাত প্রদানের তাগিদ দেয়া হয়েছে। যদি আপনি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে থাকেন, তবে কুরআনের অনেক জায়গায় পাঠ করে থাকবেন। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন—

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

অর্থাৎ, 'তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর।'

আবার অনেক জায়গায় মুসলমানদের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

অর্থাৎ, 'তারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে।'

বুঝা গেল, যারা নামায পড়ে না এবং যাকাত প্রদান করে না তারা আসলে মুসলমান নয়। কেননা ইসলামের যে বিষয়াবলী এবং যেসব গুণাবলী প্রকৃত মুসলমানের মধ্যে বিদ্যমান থাকা উচিত, তা তাদের মধ্যে নেই।

মোটকথা নামায ত্যাগ করা এবং যাকাত বর্জন করা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী মুসলমানের পরিচয় নয়। এটা কাফির-মুশরিকদের কাজ। নামাযের ব্যাপারে সূরা রূমের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

اَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থাৎ, 'তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর (আর নামায ত্যাগ করে) মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।'

সূরা ফুসসিলাতের নিম্নোক্ত আয়াতে যাকাত ত্যাগ করাকে কাফির-মুশরিকদের কাজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كَافِرُوْنَ.

অর্থাৎ, 'আর এসব মুশরিকদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, আর তাদের পরিণতি খুবই খারাপ হবে, তারা যাকাত প্রদান করে না এবং পরকালকে অস্বীকারকারী (কাফির)।'

যাকাত বর্জন করার ভীষণ শাস্তি ঃ

যাকাত বর্জনকারীদের যে পরিণতি কিয়ামতের দিন হবে আর তারা যে শাস্তির সম্মুখীন হবে, তা এতই ভীষণ যে, তা শুনতেই শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়। অন্তর ভয়ে কাঁপতে থাকে। সূরা তাওবায় ইরশাদ হয়েছে—

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ. يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ.

'আর যারা সোনা- রূপা জমা করে রাখে এবং আল্লাহর রাহে ব্যয় করে না (অর্থাৎ তাদের প্রতি যাকাত ইত্যাদি ফরয হয়েছে তা

প্রদান করে না) হে রাসূল! আপনি তাদেরকে ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তির সুসংবাদ প্রদান করুন। যেদিন দোযখের আগুনে তাদের ধনসম্পদ পোড়ানো হবে, আর তদ্দ্বারা তাদের কপালে দাগ দেয়া হবে। আর দাগ দেয়া হবে তাদের পাঁজরে ও পিঠে, (আর বলা হবে) এসব তো তোমাদের ঐ ধনদৌলত, যা তোমরা জমা করে রেখেছিলে নিজেদের জন্য। অতএব নিজেদের জমাকৃত ধনসম্পদের মজা চেখে দেখ।' (সূরা তাওবা)

এ আয়াতের আলোচ্য বিষয়কে আরো বিস্তারিতভাবে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে ইরশাদ করেন—

'যার কাছে সোনা-রূপা (ধনদৌলত) আছে, আর সে তার হক আদায় না করে (অর্থাৎ যাকাত ইত্যাদি প্রদান করে না) তবে কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের তক্তা (পাত) তৈরী করা হবে। অতঃপর তা দোযখের আগুনে আরো গরম করা হবে। তদ্দ্বারা ঐ ব্যক্তির কপাল, পাঁজর এবং পিঠে দাগ দেয়া হবে। এভাবে বারবার গরম করে করে দাগ দিয়ে যাওয়া হবে। আর কিয়ামতের পুরো কালব্যাপী এ শাস্তি চলতে থাকবে। এর পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। (সুতরাং পঞ্চাশ হাজার বছর পর্যন্ত যাকাত বর্জনকারী এই ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তিভোগ করতে থাকবে।)'

অন্যান্য হাদীসে যাকাত বর্জনকারীদের জন্য এছাড়া আরো বিভিন্ন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এসব শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দিন। আল্লাহ তাআলা যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন, তারা যদি যাকাত প্রদান না করে, আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশানুযায়ী তাঁর রাহে ব্যয় না করে, তারা নিঃসন্দেহে বড়ই অকৃতজ্ঞ এবং বড়ই জালিম। তাদেরকে যত ভীষণ শাস্তিই কিয়ামতের দিন দেয়া হোক না কেন, তা তাদের জন্য যথেষ্ট নয়।

যাকাত বর্জন করা আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকার ঃ

একটু চিন্তা করা উচিত, যাকাত–সদকা দ্বারা মূলত নিজেদেরই দরিদ্র ও অসহায় ভাইদের বিরাট উপকার সাধিত হয়। সুতরাং যাকাত না দেয়া আসলে নিজেদের ঐসব দরিদ্র ও অসহায় ভাইদের প্রতি জুলুমের নামান্তর। এ দ্বারা তাঁদের প্রাপ্য ছিনিয়ে নেয়া হয়।

প্রিয় ভাইয়েরা ! একটু চিন্তা করুন, আমাদের কাছে যা কিছু সম্পদ আছে, তা মহান আল্লাহ তাআলারই দানকৃত সম্পদ। আমরা নিজেরাও তাঁরই সৃজনকৃত বান্দা। তিনি যদি আমাদের থেকে তার দেয়া সব সম্পদই চেয়ে বসেন এমনকি তাঁর জন্য আমাদের সর্বাধিক প্রিয় প্রাণও যদি তাঁর রাহে বিলিয়ে দিতে বলেন, তবে আমাদের জন্য তো ফরয এবং অত্যাবশ্যকীয় যে, নির্দ্বিধায় ও আনন্দচিত্তে সবকিছুই তাঁর জন্য উৎসর্গ করে দেব। এটা তো আমাদের প্রতি তাঁর অনেক বড় দয়া যে, তিনি তার আদেশ পালনার্থে সম্পদের সবটুকুন দান করতে বলেননি বরং পুরো সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ তাঁর আদেশকৃত রাহে ব্যয় করতে নির্দেশ দিয়েছেন.

যাকাতের সওয়াব বা পুরস্কার ঃ

আল্লাহর নির্দেশ পালন করা আমাদের অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। তারপরও দয়াময় আল্লাহ তাআলা এই যাকাত প্রদানের পরিবর্তে অনেক বড় বড় পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। অথচ বান্দা যাকাত–সাদকা হিসেবে যাকিছু দান করে তা তো আল্লাহ তাআলারই দেয়া মাল থেকে দিয়ে থাকে। সুতরাং এর জন্য আল্লাহ যদি কোন সওয়াব না দিতেন তাতে কোন অন্যায় ছিল না। কিন্তু এটা তাঁর অনেক বড় মেহেরবানী যে, তাঁরই দেয়া মাল থেকে আমরা যাকিছু দান-খয়রাত করি। তাঁর হুকুম পালন করে তাঁর নির্দেশিত পথে ব্যয় করি, তাতে তিনি অনেক খুশী হন। এর বিনিময়ে অনেক সওয়াবের ওয়াদা তিনি ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন—

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ

سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لَا اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

'যারা আল্লাহর রাহে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা ঐ বীজের মত, যা থেকে চারা গজায়। আর তা থেকে আবার সাতটি শাখা বের হয়, প্রত্যেক শাখায় একশত শস্য উৎপন্ন হয়। আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাকে আরও বর্ধিত করে দেন। তিনি বড়ই প্রাচুর্যতা দানকারী এবং সর্বজ্ঞাতা। যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহর রাহে ব্যয় করে এবং খোঁটা দেয় না ও কষ্ট দেয় না, তাদের জন্য তাদের মহান প্রতিপালকের কাছে অনেক প্রতিদান রয়েছে। আর কিয়ামতের দিন তাদের কোন ভয় ও শংকা থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না ' (সূরা বাকারা-৩৬)

এ আয়াতে যাকাত প্রদানকারীদের জন্য, যারা আল্লাহর রাহে অকাতরে বিলিয়ে যায়, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তিনটি ওয়াদা ঘোষণা করা হয়েছে—

১. তারা যা ব্যয় করবে, আল্লাহ তাআলা তার বিনিময় বহুগুণ বর্ধিত করে দান করবেন;

২. পরকালে মহান আল্লাহর দরবারে তারা অকল্পনীয় পুরস্কারে ভূষিত হবে।

৩. কিয়ামতের বিভীষিকাময় দিবসে তাদের কোন ভয়-ভীতি থাকবে না। কোন দুঃখ ও চিন্তা তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। 'সুবহানাল্লাহ !'

প্রিয় ভাইয়েরা ! মহান আল্লাহ তাআলার এই ওয়াদার প্রতি সাহাবায়ে কিরামের পূর্ণ আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন তারা আল্লাহর রাহে ব্যয় করার মর্যাদা ও পুরস্কারের ঘোষণা সম্বলিত কুরআনের আয়াত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর নবীজী থেকে তার বর্ণনা শুনতে পেলেন, তখন তাঁদের মধ্যে যাঁরা দরিদ্র ছিলেন, যাঁদের কাছে দান করার মত টাকা-পয়সাও ছিল না, তাঁরাও সাদাকার পুরস্কার লাভের অদম্য স্পৃহা নিয়ে দিন-মজুরীর কাজে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। নিজেদের পিঠে বোঝা টেনে টেনে টাকা উপার্জন করেন এবং আল্লাহর রাহে বিলিয়ে দেন। (রিয়াদুস সালিহীন, বুখারী, মুসলিম)

যাকাতের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে এখানে আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মাত্র হাদীস উপস্থাপন করছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'তিনটি বিষয় আছে, যে ব্যক্তি এগুলো পালন করবে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে—

১. শুধু আল্লাহরই ইবাদত করবে।

২. لا اله الا الله এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে।

৩. উৎফুল্লচিত্তে প্রতি বছর নিজের সম্পদের যাকাত প্রদান করবে।' (আবু দাউদ)

(যে ব্যক্তি উপরোক্ত তিনটি বিষয় অর্জন করবে, সে ঈমানের স্বাদ উপভোগ করে ধন্য হবে।)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ঈমানের স্বাদ এবং তার মজা অনুভব করার তাওফীক দান করুন। আমীন !

যাকাত-সাদাকার পার্থিব উপকার ঃ

এতক্ষণ তো আমরা যাকাত-সাদাকার পরকালীন উপকার ও বড় বড় পুরস্কারের কথা শুনলাম। এছাড়াও যাকাত-সাদাকার মাধ্যমে পার্থিব অনেক উপকার সাধিত হয়ে থাকে। যেমন, যাকাত দানকারীর অন্তর সবসময় আনন্দভরা এবং শান্তিময় থাকে। দরিদ্রদের প্রতি তার ঘৃণা থাকে না। তাদের প্রতি তার সহানুভূতি জাগ্রত হয়। তাদের কল্যাণে সে চিন্তিত হয়ে পড়ে। তাদের জন্য দুআ করে। তাদের প্রতি সে দয়ার দৃষ্টিতে দেখে। সাধারণ পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকেও এমন ব্যক্তির সম্মান সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সাধারণ মানুষের ভালবাসা এবং সহানুভূতি লাভে

ধন্য হয়। আল্লাহ তাআলা তার ধনসম্পদে অনেক বরকত দান করেন। একটি হাদীসে এসেছে—প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান—

'মহান আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে, হে আদম সন্তান! তুমি (আমার দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত বান্দাদের প্রতি এবং অন্যান্য উত্তম পথে) আমার দেয়া সম্পদ থেকে ব্যয় করতে থাক। আমি তোমাকে সর্বদাই দিয়ে যেতে থাকব।'

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'আমি এ ব্যাপারে কসম করে বলতে পারি যে, কেউ দান-খয়রাত করলে (অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার দরুন) দরিদ্র ও ফকির হয়ে যায় না।'

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব বাণীর উপর বাস্তবিক ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস নসীব করুন এবং আনন্দচিত্তে এ সবের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সবক ঃ ৪

রোযা

রোযা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয কাজ ঃ

ইসলামের মৌলিক শিক্ষার মধ্যে ঈমান, নামায ও যাকাতের পর রোযার স্থান। এটা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

কুরআনে কারীমে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

'হে ঈমানদারেরা ! তোমাদের প্রতি রোযা পালন করা ফরয করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের প্রতিও ফরয করা হয়েছিল। যেন তোমাদের মাঝে তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি হয়।'

(সূরা বাকারা–২৩)

ইসলামে পূর্ণ রমযান মাসের রোযা ফরয। যে ব্যক্তি বিনা কারণে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রমযানের একটি রোযা ছেড়ে দেয়, তবে সে খুব ভীষণ গুনাহগার হবে। একটি হাদীসে এসেছে—

'যে ব্যক্তি বিনা কারণে সুস্থ অবস্থায় রমযানের একটি রোযা ত্যাগ করে, আর এর পরিবর্তে যদি সে সারাজীবনও রোযা রাখে, তবুও রমযানের ঐ একটি রোযার সমমান হবে না।'

রোযার পুরস্কার ঃ

রোযার মধ্যে যেহেতু খাওয়া–দাওয়া ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা থেকে নিজের মনকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে বাধা দেয়া হয়, একমাত্র আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে নিজের প্রবৃত্তিগত চাহিদাকে বিসর্জন দেয়া হয় এজন্য আল্লাহ তাআলাও এর সওয়াব ও পুরস্কার সবচেয়ে বেশী নির্ধারণ করেছেন। একটি হাদীসে এসেছে—

'বান্দাদের সব সৎকাজের পুরস্কার প্রদানের এক বিশেষ নীতি

নির্ধারিত আছে। সব আমলের পুরস্কার ঐ নির্ধারিত নিয়মেই প্রদান করা হবে কিন্তু রোযার পুরস্কার এসব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ বান্দা রোযা রেখে আমারই জন্য তার খাওযা-দাওয়া ও নফসের খায়েশাতকে বিসর্জন দেয়, এজন্য রোযার প্রতিদান বান্দাকে আমি সরাসরি আমার হাতে দান করব।'

অন্য এক হাদীসে এসেছে—

'যে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমান-বিশ্বাসের সাথে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এবং তাঁর থেকে সওয়াব অর্জন করার নিমিত্তে রমযানের রোযা রাখবে, তার পূর্ববর্তী সমূহ গুনাহকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।'

আরো একটি হাদীসে এসেছে—

'রোযাদার ব্যক্তির দুটো খুশির বিশেষ সময় রয়েছে। একটি বিশেষ খুশী ও আনন্দ সে ইফতার করার সময় দুনিয়াতেই লাভ করে। আর দ্বিতীয় আনন্দ উপভোগ করবে যখন সে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হয়ে রোযার পুরস্কার লাভ করবে।'

অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে—

'রোযা দোযখের ঢালস্বরূপ এবং তা একটি মজবুত কেল্লা। (যা রোযাদারকে দোযখের আগুন থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখবে।)'

আরেকটি হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ (যা কখনো পাকস্থলী খালি থাকার দরুন সৃষ্টি হয়) মহান আল্লাহ তাআলার কাছে মিশকে আম্বরের চাইতেও প্রিয়।'

এসব হাদীসে রোযা সংক্রান্ত যেসব বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হল, এছাড়াও রোযার এক বড় বৈশিষ্ট্য হল, রোযা মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে। যখন মন চাইল খেয়ে নিল, মন চাইল তো কিছু পান করে নিল, প্রবৃত্তির তাড়না আলোড়িত করল ব্যস, নিজের সঙ্গিনীর

সাথে মেলামেশা করে মজা উপভোগ করে নিল—এ সবই জন্তু-জানোয়ারের বৈশিষ্ট্য, কখনো খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করা, সঙ্গিনী থেকে দূরে থাকা, প্রবৃত্তির তাড়নাকে দমন করা—এসব ফেরেশতাসুলভ মানবিক উচ্চ অবস্থান। সুতরাং রোযা রেখে মানুষ অন্যসব জন্তু-জানোয়ার থেকে বৈশিষ্ট্যময় হয়ে ওঠে। ফেরেশতাদের সাথে এ ধরনের সামঞ্জস্যতা সে লাভ করে।

রোযার বিশেষ উপকার ঃ

রোযার বিশেষ একটি উপকার হল, এর দরুন মানুষের মাঝে তাকওয়া ও পরহেযগারী সৃষ্টি হয়। সৎপথে চলার অনুপ্রেরণা লাভ করে। নিজের প্রবৃত্তির দুর্দান্ত ঘোড়ার লাগাম নিজ হাতে নেয়ার শক্তি ও যোগ্যতা অর্জন করে। আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে নিজের প্রবৃত্তিগত চাহিদা দমন করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। আত্মার এক অলৌকিক প্রশিক্ষণ ও তার উন্নতি সাধিত হয়। যা একজন মানুষকে পশুত্বের গণ্ডি থেকে বের করে এনে মানুষের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়।

কিন্তু এসব তখনই অর্জিত হবে, যখন রোযাদার নিজেও এসব অর্জন করার নিয়ত রাখবে। সাথে সাথে রোযার মধ্যে ঐসব বিষয়ের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে, যার দিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথনির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া ছাড়াও সকল ছোটবড় গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। মিথ্যা বলবে না, পরনিন্দা (গীবত) করবে না। কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করবে না। মোটকথা, রোযা থাকাকালীন সকল বাহ্যিক এবং আত্মিক গুনাহ থেকে পুরোপুরি বাঁচবে। যেমন হাদীসে এর প্রতি তাগিদ করা হয়েছে।

এ সম্পর্কিত একটি হাদীসে জনাব নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

> 'যখন তোমাদের রোযার সময় হয়, তখন তোমাদের বাজে কথাবার্তা মুখ থেকে বের করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কোন শোরগোলও করবে না, যদি তাকে কেউ গালি দেয় বা তার সাথে ঝগড়া করতে আসে, তবে সে সোজা এটা বলে দিবে যে, আমি

রোযাদার। (এজন্য তোমার গালির জবাব দিতে পারছি না।)'

অন্য এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যে ব্যক্তি রোযা রেখেও বাজে কথাবার্তা এবং অসংকাজ ত্যাগ করে না, তবে তার খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করার কোন প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার নেই।'

আরো একটি হাদীসে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান—

'এমন কত রোযাদার আছে (যারা রোযা রেখে বাজে কথাবার্তা ও বাজে কাজকর্ম ত্যাগ করে না, আর এজন্য) তাদের রোযার অর্জন ক্ষুধা-পিপাসা ছাড়া আর কিছুই হয় না।'

মোটকথা, রোযার বদৌলতে আত্মার পবিত্রতা এবং তাকওয়া ও পরহেযগারীর গুণ তখনই অর্জিত হবে, প্রবৃত্তির উন্মাদ ঘোড়ার লাগাম তখনই দৃঢ় হাতে ধরতে পারবে যখন খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করার মত অন্যান্য সব ছোটবড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। বিশেষ করে মিথ্যা কথন, পরনিন্দা এবং গালিগালাজ ইত্যাদি থেকে জিহ্বাকে হেফাজত করা হবে।

যদি এভাবে পরিপূর্ণ রোযা রাখা যায়, তবে ইনশাআল্লাহ উপরোল্লিখিত উপকারসমূহও অর্জন করা যাবে। আর এমন রোযাই মানুষকে ফেরেশতাসুলভ চরিত্রের অধিকারী করে দেয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন, যেন আমরা রোযার মূলকথা ও তার মূল্য অনুধাবন করতে পারি। আর এর মাধ্যমে আমরা যেন আমাদের মধ্যে তাকওয়া-পরহেযগারী সৃষ্টি করতে পারি।

(রোযা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে লেখকের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বারাকাতে রামাদান' (রমযানের বরকত) অধ্যয়ন করা যেতে পারে।)

হজ্জ

হজ্জ ফরয ঃ

ইসলামের স্তম্ভগুলোর মধ্যে সর্বশেষ স্তম্ভ হল—হজ্জ। কুরআন মাজীদে হজ্জকে ফরয ঘোষণা করে ইরশাদ হয়েছে—

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ.

'আর আল্লাহর জন্য বাইতুল্লাহর হজ্জ পালন করা ফরয, তাদের জন্য যারা সেখান পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে। আর যারা তা অমান্য করবে, আল্লাহ সব জগত থেকে বেপরোয়া।'

(সূরা আলে ইমরান-৯৭)

এ আয়াতে হজ্জ ফরয হওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। সাথে সাথে এও বলা হয়েছে যে, হজ্জ ফরয শুধু ঐসব লোকেদের উপর যারা সেখানে পৌঁছার শক্তি-সামর্থ্য রাখে। আয়াতের শেষাংশে এ ইঙ্গিতও করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে হজ্জ করার শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছেন, অথচ তারা অকৃতজ্ঞতাভরে হজ্জ করে না, (যেমন আজকাল অনেক সম্পদশালী লোক হজ্জ করে না) আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেপরোয়া। ফলে হজ্জ না করার দরুন যদিও তাদের কোন অসুবিধা হবে না, তবে অকৃতজ্ঞতার দরুন এবং মহান আল্লাহর নেয়ামতের মূল্য না দেয়ার কারণে এসব অকৃতজ্ঞ বান্দারা নিজেরাই মহান আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। 'আল্লাহ না করুন!' তাদের পরিণতিও খুবই ভয়াবহ হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে ইরশাদ করেন—

'যাকে আল্লাহ তাআলা এ পরিমাণ সম্পদ দিয়েছেন যে, সে তা দিয়ে হজ্জ সম্পাদন করতে সক্ষম, তারপরও যদি সে হজ্জ আদায় না করে, তবে তাতে কারো কিছু আসে যায় না—চাই সে

ইহুদী হয়ে মরুক বা খৃষ্টান হয়ে মরুক।'

ভাইয়েরা! আমাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র ইসলামের মূল্য থাকে, আর আল্লাহ ও রাসূলের সাথে একটুও সম্পর্ক থাকে, তাহলে উপরোক্ত হাদীসখানা বুঝে নেয়ার পর আমাদের মধ্যে যাদের সে শক্তি-সামর্থ্য রয়েছে তাদের কারো জন্য হজ্জ থেকে মাহরুম হওয়া উচিত নয়।

হজ্জের বরকত ও ফযীলত ঃ

অনেক হাদীসে হজ্জের এবং হাজীদের সম্পর্কে বড়ই ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। এখানে দু-তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে।

একটি হাদীসে এসেছে—

'হজ্জ ও ওমরা করার জন্য যারা আল্লাহর ঘরে যায় তারা আল্লাহ তাআলার বিশেষ মেহমান। তারা যদি আল্লাহর দরবারে দুআ কামনা করে তবে আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেন। যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তাকে তিনি ক্ষমা করে দেন।'

অন্য এক হাদীসে এসেছে—

'যে ব্যক্তি হজ্জ করবে, আর তার মধ্যে কোন অযথা ও অবৈধ কোন কাজ করবে না আর আল্লাহর কোন নাফরমানী করবে না তবে সে গুনাহ থেকে এমন পরিষ্কার হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে, যেমন সে জন্মলগ্নে একদম বেগুনাহ ছিল।'

আরেকটি হাদীসে এসেছে—

'মাবরুর হজ্জ' (অর্থাৎ ঐ হজ্জ যা খুবই ইখলাসের সাথে একেবারে ঠিকঠাকভাবে সম্পাদন করা হয়েছে এবং তাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেনি) তার বিনিময় শুধু জান্নাত আর জান্নাত।'

হজ্জের নগদ মজা ঃ

হজ্জের বরকতে গুনাহ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্তি ও জান্নাতের নিয়ামতরাজি লাভ করা—তা তো পরকালে পাওয়া যাবে কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলা বিশেষ বরকতময় রহমতের বিচ্ছুরণস্থল এবং তাঁর নূরের বিশেষ কেন্দ্রস্থল বাইতুল্লাহ শরীফ (মক্কা মুকাররমা) দেখে এবং মক্কা মুকাররমার ঐ সব

স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ যা হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইসমাঈল (আঃ) ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিকে তাজা করে দেয়, এখনো যা ওখানে অবস্থিত, ঈমানদারদের যে ঐশী স্বাদ অর্জিত হয়, তাও এ দুনিয়াতে সত্যই এক জান্নাতী নিয়ামত। মদীনা শরীফে হুযূরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রওজা মুবারকের যিয়ারত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক মসজিদে নামায আদায় করা, সরাসরি পেয়ারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে সালাত ও সালামের হাদিয়া পেশ করা, মদীনার অলিগলিতে এবং বাগবাগিচায় বিচরণ করা, সেখানকার আবহাওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া, সেখানকার পবিত্র ভূমিতে এবং আবহাওয়ামণ্ডলে ঘূর্ণায়মান সুগন্ধি থেকে নিজের মন-মগজকে উদ্ভাসিত করা, প্রিয়নবীজীর কথা স্মরণ করে তাঁর প্রেমের অমীয় সুধায় অন্তরে প্রশান্তি লাভ করা, কখনো হাসা আবার কখনো কেঁদে ফেলা—এ সবই তো এমন স্বাদ যা হাজীরা মক্কা-মদীনায় পৌছে সেখানে অবস্থানকালে অহরহই আস্বাদন করতে থাকেন। তবে সবাই নয়। আল্লাহ তাআলা যাঁদেরকে এমন অন্তরাত্মা দান করেছেন, তারাই শুধু এসব অলৌকিক স্বাদ আস্বাদন করে ধন্য হন। আসুন ! আমরা দুআ করি মহান আল্লাহর দরবারে, তিনি যেন তার অপার দয়া ও মহিমায় আমাদেরকেও এর স্বাদ উপভোগ করার মহান মর্যাদা দানে বাধিত করেন। আমীন।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ ঃ

ইসলামের যে পাঁচটি মৌলিক শিক্ষার আলোচনা এতক্ষণ হল, অর্থাৎ কালিমা, নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ ; এগুলোকে 'আরকানে ইসলাম' বা ইসলামের মূল খুঁটি বলা হয়। প্রিয়নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রসিদ্ধ হাদীস, তিনি ইরশাদ করেন—

'ইসলামের ভিত্তি এ পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত—

১. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -এর সাক্ষ্য প্রদান করা।

২. নামায কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা।

৩. যাকাত প্রদান করা।

৪. রমযান মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখা।

৫. যারা সামর্থ্যবান তাদের জন্য হজ্জ আদায় করা।'

এ পাঁচটি বিষয় 'ইসলামের ভিত্তি' হওয়ার অর্থ হল, এগুলো ইসলামের মৌলিক ফরয কাজ। এ পাঁচটি বিষয়ের উপর দৃঢ় অবস্থানে দাঁড়াতে পারলে ইসলামের অন্যসব আচার-অনুষ্ঠান পালনের যোগ্যতা তৈরী হয়ে যায়।

এখানে শুধু এই 'আরকানে ইসলামের' গুরুত্ব ও ফযীলত বা প্রতিদানের বর্ণনা দেয়া হল। এতদসম্পর্কিত বিস্তারিত বিধি-বিধান ও মাসআলা-মাসায়িল জানার জন্য ফিকাহ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর বা বিজ্ঞ ও হক্কানী উলামায়ে কিরামের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

সবক ঃ ৬

তাকওয়া এবং সংযমশীলতা

তাকওয়া বা খোদাভীতি, পরহেযগারী বা সংযমশীলতার শিক্ষাও ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলোর অন্যতম। তাকওয়ার অর্থ হল, পরকালের হিসাব-কিতাব, পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি বিশ্বাস নিয়ে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার কাছে জবাবদিহিতা এবং তার শাস্তির ভয়ে সমূহ মন্দ ও অবৈধ কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকা। আর আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেসব বিষয় আমাদের প্রতি ফরয বা অবশ্য পালনীয় করেছেন, আর তাঁর বান্দাদের যা যা হক বা অধিকার আমাদের প্রতি নির্ধারণ করেছেন, তা সবই আমরা পালন করব। যেসব কাজকর্ম ও আচার-ব্যবহারকে হারাম ও অবৈধ করেছেন, সেসব থেকে বেঁচে থাকব। এর ধারে-কাছেও যাব না। আর তার ভীষণ শাস্তিকে ভয় করতে থাকব। কুরআন-হাদীসে ভীষণ গুরুত্বের সাথে বারংবার এই তাকওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এখানে মাত্র কয়েকটি কুরআনের আয়াত ও হাদীস সন্নিবেশিত হচ্ছে। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

'হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁকে যেমন ভয় করা দরকার, (আর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই তাকওয়ার সাথে তাঁর আনুগত্য কর।) আর এই আনুগত্যের সাথেই যেন তোমাদের মৃত্যু আসে।' (সূরা আলে ইমরান)

সূরা তাগাবুনে মহান আল্লাহ ইরশাদ ফরমান—

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا.

'আল্লাহকে ভয় কর এবং তাকওয়া অর্জন কর, যতদূর

তোমাদের জন্য সম্ভব। আর তাঁর সমূহ বিধি-বিধান শোন এবং মেনে চল।' (সূরা তাগাবুন-২)

সূরা হাশরে ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّ اتَّقُو اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

'হে ঈমানদারেরা! আল্লাহকে ভয় কর (আর তাকওয়া অর্জন কর) আর প্রত্যেকেরই উচিত যে, সে দেখবে এবং চিন্তা করবে যে, সে কালকের জন্য (অর্থাৎ পরকালের জন্য) কি কাজ করেছে। আর শোন! আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তিনি তোমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।'

(সূরা হাশর-৩)

কুরআন শরীফ থেকেই বুঝা যায় যে, যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, তাকওয়া অর্জন করে এবং পরহেযগারী বা সংযমশীলতার সাথে জীবন-যাপন করে, দুনিয়াতেও তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ দয়া ও প্রতিদান রয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্যও করে থাকেন।

অন্যত্র ইরশাদ করেন—

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

'আর যারা আল্লাহকে ভয় করে (আর তাকওয়ার সাথে জীবন-যাপন করে) আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদের বিপদাপদ থেকে বাঁচাবার রাস্তা বের করে দেন। আর তাদেরকে এমনভাবে জীবিকা দান করেন, যা তাদের কল্পনারও বাইরে।'

(সূরা তালাক)

কুরআনে কারীম থেকেই বুঝা যায় যে, যাঁদের মধ্যে তাকওয়া অর্জিত হয়ে যায়, তাঁরা আল্লাহর ওলী হয়ে যান। তারপর আর কোন কিছুর ভয় এবং কোন দুঃখ তাদের থাকে না।

ইরশাদ হয়েছে—

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ.

'জেনে রাখ! যারা আল্লাহর ওলী হয়, তাদের কোন ভয়-ভীতি এবং চিন্তা-ফিকির থাকে না। এরা তাঁরাই যারা সত্যিকার মুমিন এবং তাকওয়া অর্জনকারী। তাদের জন্য সুসংবাদ—দুনিয়াতে এবং পরকালেও।' (সূরা ইউনুস)

এই তাকওয়া অর্জনকারী এবং সংযমশীল লোকেরা পরকালে যেসব পুরস্কার লাভ করবে, তার সম্যক ধারণা নিম্নের আয়াতে লাভ করা যায়।

ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ.

(হে নবী তাদেরকে) আপনি বলুন! আমি কি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় সম্পর্কে বলে দেব? যা তোমাদের পার্থিব সব পছন্দনীয় বিষয়াবলী এবং মজাদার জিনিস থেকেও উত্তম। শোন! যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তাকওয়ার সাথে জীবনযাপন করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে এমন বেহেশতী বাগানসমূহ রয়েছে, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হবে। আর তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে। আর এমন সুন্দরী রমণী রয়েছে, যারা ভীষণ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। (আর তাদের জন্য) মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি রয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা তার সব বান্দাদেরকে খুব ভাল ভাবেই দেখেন। (সবার বাহ্যিক ও আত্মিক অবস্থা তাঁর দৃষ্টিতে রয়েছে।)'

(সূরা আলে ইমরান)

এ সম্পর্কে 'সূরা সোয়াদের' এ আয়াতটি লক্ষ্যণীয়।

ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَآبٍ. جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ. مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّ شَرَابٍ وَ عِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِنْ نَّفَادٍ.

'আর তাকওয়া অর্জনকারী বান্দাদের জন্য খুব উত্তম ঠিকানা চিরস্থায়ী জান্নাত, তাদের জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত, সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে চাইবে অনেক ফলমূল ও পানীয়। তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কা রমণীগণ। তোমাদেরকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে কিয়ামত দিবসের জন্য। এটা আমার দেয়া জীবিকা যা শেষ হবে না।' (সূরা সোয়াদ ৪৯–৫৪)

কুরআন মজীদেই তাকওয়া অর্জনকারী বান্দাদেরকে এ সুসংবাদও শোনানো হয়েছে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের স্ববিশেষ নৈকট্য লাভ করে ধন্য হবে। 'সূরা কামার'–এর শেষ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান––

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ نَهَرٍ فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ.

'তাকওয়া অর্জনকারী বান্দাগণ (পরকালে) বেহেশতের বাগানসমূহ ও ঝর্ণাসমূহে অবস্থান করবে, একটি যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।' (সূরা কামার ৫৩–৫৫)

কুরআন মজীদে এ–ও ঘোষণা করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাআলার কাছে সভ্যতা ও সম্মানের চাবিকাঠিই হচ্ছে—তাকওয়া।

ইরশাদে ইলাহী—

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ.

'তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত আল্লাহ তাআলার কাছে ঐ ব্যক্তি, যে বেশী তাকওয়া অর্জনকারী।' (সূরা হুজুরাত)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একটি হাদীসে ইরশাদ করেন—

'আমার নৈকট্য অর্জনকারী এবং আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ঐসব লোকেরা, যাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ বিদ্যমান আছে। চাই সে যে কোন জাতি-গোষ্ঠীর হোক না কেন। আর সে যে কোন অঞ্চলেরই হোক।'

'তাকওয়া' অর্থাৎ খোদাভীতি এবং পরকাল চিন্তা সমস্ত সৎকাজের মূল। যে ব্যক্তির মাঝে যতটুকু তাকওয়া হবে তার মধ্যে ততই সৎকর্ম এবং উত্তম চেতনা বিদ্যমান থাকবে। আর ততই সে অসৎকাজ থেকে দূরে অবস্থান করবে। হাদীস শরীফে এসেছে—

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী (রাযিঃ) তাঁকে একবার আবেদন করলেন যে, হযরত! আমি আপনার অনেক উপদেশ বাণী শুনেছি। আমার ভয় হয়, এত উপদেশ কি আমার মনে থাকবে? এজন্য হুযূরের কাছে আমার আবেদন হল, আমাকে এমন সর্বব্যাপী একটি উপদেশ দান করুন যা আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ নিজের জ্ঞান ও ধারণার শেষসীমা পর্যন্ত আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর এই ভয়, চিন্তা এবং তাকওয়ার সাথে জীবন যাপন কর। অর্থাৎ তুমি যদি এই একটি কথাই মনে রাখ এবং তদানুযায়ী আমল কর, ব্যাস, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।'

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যার ভয় থাকবে, সে প্রভাত হতেই লক্ষ্যপানে ছুটতে থাকবে। যে সকাল-সকাল লক্ষ্যের দিকে চলতে শুরু করবে, সে যথাসময়েই মনযিলে মাকসাদে পৌঁছে যাবে।'

মোটকথা, সৌভাগ্যবান ও সফলকাম ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহকে ভয় করে পরকালের চিন্তা করে চলে। আল্লাহ এবং তার ভীষণ শাস্তিকে ভয় করে যদি এক ফোটা অশ্রুও চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে, তা মহান আল্লাহর

দরবারে অনেক মূল্যবান। হাদীস শরীফে এসেছে—

'মহান আল্লাহ তাআলার কাছে দুটো ফোটা এবং দুটো চিহ্ন থেকে অধিক প্রিয় আর কোন জিনিস নেই। যে দুটো ফোটা আল্লাহর কাছে প্রিয়, তন্মধ্যে একটি হল আল্লাহর ভয়ে চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া এক ফোটা অশ্রু। দ্বিতীয়টি হল ঐ রক্তের ফোটা যা আল্লাহর রাহে শরীর থেকে গড়িয়ে পড়ে। আর দুটো চিহ্ন আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়। তন্মধ্যে একটি হল শরীরে ঐ ক্ষতচিহ্ন যা আল্লাহর রাহে সংঘটিত হয়েছে। (অর্থাৎ জিহাদের ময়দানে আহত হয়েছে এবং তার চিহ্ন রয়ে গেছে।) আর দ্বিতীয় চিহ্ন হল ঐ চিহ্ন যা আল্লাহ তাআলার ফরয বিধি-বিধান পালন করতে গিয়ে তার শরীরে অঙ্কিত হয়ে গেছে। (যেমন নামাযী ব্যক্তির কপালে সিজদার চিহ্ন এবং পায়ের গোড়ালীতে পড়ে যাওয়া বৈঠকের চিহ্ন।)'

আরেকটি হাদীসে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'এমন লোক কক্ষণো দোযখে যেতে পারে না যে আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে থাকে।'

মোটকথা, সত্যিকার আল্লাহর ভয় এবং পরকাল-চিন্তা যদি কারো ভাগ্যে জুটে যায়, এটা ত র অনেক বড় প্রাপ্য। আর এই খোদাভীতি এবং পরকাল-চিন্তা মানুষের জীবনকে সোনায় পরিণত করে।

ভাইয়েরা! খুব ভাল করে বুঝে নিন, এই কয়েক দিনের দুনিয়াতে যে আল্লাহকে ভয় করতে থাকবে, মৃত্যুর পর পরকালীন অনন্ত জীবনে তার আর কোন ভয় থাকবে না। তার কোন দুঃখ-কষ্ট হবে না। কোন ধরনের চিন্তা-ফিকির তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। মহান আল্লাহ তাআলার অপার করুণা আর মহাপুরস্কারের মাঝে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় ও আনন্দঘন জীবন লাভ করবে। আর যে এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনে আল্লাহকে ভয় করবে না, পরকালের সহায়-সম্পদের চিন্তা করবে না, পার্থিব তুচ্ছ স্বস্তিতে মজে যাবে, সে পরকালে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দুঃখ-কষ্টের পাহাড় কাঁধে নিয়ে ফিরবে, অনন্ত জীবন রক্তকান্নায় কাটাতে হবে।

কিভাবে তাকওয়া অর্জন করা যায়?

'তাকওয়া' অর্থাৎ খোদাভীতি ও পরকাল চিন্তা অর্জন করার সবচেয়ে উত্তম ও কার্যকরী মাধ্যম হল, আল্লাহ তাআলার নেক বান্দা ও সৎকর্মশীল কোন আল্লাহওয়ালার সাহচর্য গ্রহণ করা। যিনি আল্লাহকে ভয় করেন, আর তার বিধি–বিধান মেনে চলেন। দ্বিতীয় মাধ্যম হল, ভাল–ভাল নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় গ্রন্থাবলী পাঠ করা আর শোনা। তৃতীয় মাধ্যম হল, নির্জনে বসে বসে নিজের মৃত্যুর কথা কল্পনা করা। মৃত্যুর পর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সৎকাজের পুরস্কার ও অসৎকাজের শাস্তির ধ্যান করা। নিজের জীবনের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করবে, চিন্তা করবে যে কবরে আমার কী অবস্থা হবে? কিয়ামতের দিন যখন সব বান্দাকে পুনরোত্থিত করা হবে, তখন আমার কী অবস্থা হবে? যখন আমি আমার রবের সামনা–সামনি হবো আর আমার কৃতকর্মের দাস্তান আমার সামনে খুলে ধরা হবে, তখন আমি কী জবাব দেব? তখন কোথায় আমার মুখ লুকাবো? যে ব্যক্তি এসব পন্থা অবলম্বন করবে, ইনশাআল্লাহ সে অবশ্যই তাকওয়া অর্জন করে ধন্য হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এ মহান গুণটি অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন !

সবক ঃ ৭

লেন-দেন ও আচার-ব্যবহারে সততা, হালাল জীবিকা ও মানবাধিকারের গুরুত্ব

কাজে-কর্মে ও আচার-ব্যবহারে সততা এবং ঈমানদারীর শিক্ষাও ইসলামের মৌলিক ও ভিত্তিগত শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

• কুরআনে কারীম ও হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বুঝা যায় যে, প্রকৃত মুসলমান সেই, যে তার আচার-ব্যবহার ও কাজকর্মে সততা ও ঈমানদারীর পরিচয় দেয়। অঙ্গিকারে দৃঢ় এবং ওয়াদায় অনড় অবস্থানের অধিকারী। অর্থাৎ ধোঁকা, প্রতারণা ও খিয়ানত সে করে না। কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না। লেনদেন ও মাপ-জোকে কম দেয় না। মিথ্যার ভিত্তিতে মোকদ্দমা লড়ে না। মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। সুদ-ঘুষের মত জঘন্য হারাম রোজগার থেকে বেঁচে থাকে। আর যারা এসব অসৎকর্ম থেকে নিজেদেরকে বাঁচায় না, কুরআন-হাদীসের পরিভাষায় তারা প্রকৃত মুমিন ও আসল মুসলমান নয়। বরং এরা এক ধরনের মুনাফিক। ভীষণ শ্রেণীর ফাসিক ও অসৎকর্ম পরায়ণ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এসব অসৎ কাজকর্ম থেকে পরিত্রাণ দিন। এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এখানে তার প্রতি সম্যক আলোকপাত করা হল।

কুরআন মজীদে আল্লাহ সুবহানুহু ওয়াতাআলা ইরশাদ করেন—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা কোন ভুল ও ভ্রান্ত পন্থায় অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করো না।'

আয়াতটি জীবিকা অর্জনের ঐসব পন্থাকে হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করেছে যা সম্পূর্ণ ভুল ও ভ্রান্ত। যেমন, ধোঁকা ও প্রতারণার ব্যবসা। আমানতের খিয়ানত, জুয়া, সুদ-ঘুষ ইত্যাদি। অন্য এক আয়াতে আলাদা আলাদা ভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, যে

দোকানকার ও মহাজন মাপে, ওজনে ধোঁকাবাজি ও বেঈমানী করে, তাদের সম্পর্কে বিশেষভাবে ইরশাদ হয়েছে—

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ. وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ. أَلَا يَظُنُّ أُولٰئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ. لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ. يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

'যারা মাপে কম করে, তাদের জন্য দুর্ভোগ। যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। সেই মহাদিবসে। যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বপালনকর্তার সামনে।'

(সূরা মুতাফ্‌ফিফীন)

অন্যের অধিকার এবং অন্যের আমানত যথাস্থানে পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلٰى أَهْلِهَا.

'আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, যাদের যেসব আমানত (এবং যে অধিকার) তোমাদের প্রতি রয়েছে, তা তাদের প্রতি সঠিকভাবে আদায় কর।' (সূরা নিসা)

কুরআন মজীদের দুই জায়গায় [১] প্রকৃত মুসলমানের এ গুণ ও পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদে ইলাহী—

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ.

'আর তারা আমানতসমূহ আদায়কারী এবং ওয়াদা পূর্ণকারী।'

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অধিকাংশ খুৎবা এবং ওয়াজে ইরশাদ করতেন—

'মনে রাখবে! যার মাঝে আমানতের গুণ নেই তার মাঝে

---

১. একবার সূরা মুমিনূনে আরেকবার সূরা মা'আরিজে।

ঈমানও নেই। আর যে ওয়াদা-অঙ্গীকারের ধারে কাছে নেই, সে এ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়।'

অন্য এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'মুনাফিকের তিনটি পরিচয়। ১. মিথ্যা বলা ২. আমানতে খিয়ানত করা ৩. ওয়াদা পূর্ণ না করা।'

ব্যবসায় ধোঁকাবাজি ও প্রতারণাকারীদের সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যে ধোঁকাবাজি করে সে আমাদের (উম্মতের) অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রতারণা ও ধোঁকা দোযখের দিকে ধাবিতকারী দুটো অভ্যাস।'

এ কথা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইরশাদ করেন, যখন একদিন তিনি মদীনার বাজারে গিয়ে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে, সে তরিতরকারীর এক বিশাল স্তূপ নিয়ে বসে আছে। তার উপরের অংশে ভাল ভাল তরকারী এবং নীচে খারাপ তরকারী রেখে দিয়েছে। আর তখনই তিনি ইরশাদ করেন—

'এমন ধোঁকাবাজ আমাদের দলভুক্ত নয়।'

অতএব যে দোকানদার তার গ্রাহকদেরকে পণ্যের উত্তম নমুনা প্রদর্শন করে আর তাতে যে ত্রুটি আছে তা প্রকাশ করে না। প্রিয়নবীর হাদীসানুযায়ী সে প্রকৃত মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। 'আল্লাহ না করুন'! সে অবশ্যই দোযখের পথে চলছে।

অন্য আরেকটি হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যে কেউ এমন কোন পণ্য কারো কাছে বিক্রি করে, যাতে কোন ধরনের ত্রুটি বিদ্যমান থাকে, আর তা লুকিয়ে রাখে, তবে এমন বিক্রেতা সর্বদা আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টিতে জর্জরিত থাকবে। (অন্য বর্ণনা মতে) ফেরেশতারা সবসময় তার প্রতি অভিশাপ করতে থাকেন।'

মোটকথা, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে সবধরনের ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা সম্পূর্ণ হারাম এবং অভিশপ্ত কাজ। আর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের অসৎ ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে তাদের সাথে নিজের কোন ধরনের সম্পর্কের অস্বীকৃতির ঘোষণা দিয়েছেন। আর তাদেরকে ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত বলে অভিহিত করেছেন।

ঠিক তেমনি সুদঘুষের লেনদেনও (যদিও উভয়ের সম্মতিতে হয়) স্পষ্ট হারাম। এসব লেনদেনকারীদের প্রতি হাদীসে পরিষ্কার অভিশাপ বাণী উচ্চারিত হয়েছে। সুদ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'সুদদাতা ও গ্রহীতার প্রতি আল্লাহর অভিশম্পাত পতিত হোক, অভিশাপ বর্ষিত হোক সুদের দলীল লেখকের প্রতি এবং এর সাক্ষীদাতাদের প্রতি।'

তেমনি ঘুষের ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

'রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুসদাতা ও গ্রহীতার প্রতি অভিশম্পাত করেছেন।'

এমনকি একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এও ইরশাদ করেন—

'কোন ব্যক্তি অন্য কারো জন্য কোন (বৈধ) ব্যাপারে সুপারিশ করল। অতঃপর ঐ ব্যক্তি সুপারিশকারীকে হাদিয়া পেশ করল এবং সে তা গ্রহণ করল। এতে সে অনেক বড় গুনাহর কাজ করল। (অর্থাৎ এটাও এক ধরনের ঘুষ)।'

মোদ্দা কথা, সুদঘুষের লেনদেন, ব্যবসায় ধোঁকাবাজী এবং প্রতারণা ইসলামে সবই একই রকম জঘন্য হারাম। আর এসব থেকে আরও জঘন্য হল, মিথ্যা মামলার মাধ্যমে বা জোর-জবরদস্তি করে অন্য কারো সম্পদ আত্মসাৎ করা। একটি হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'কেউ যদি অন্য কারো জমির কিছু অংশ অবৈধ জবরদখল করে, তবে কিয়ামতের দিন (তাকে এ শাস্তি দেয়া হবে) জমির ঐ টুকরোতে তাকে দাবিয়ে দেয়া হবে। এমনকি সে নিচের দিকে দাবতে দাবতে জমির একদম নিম্নস্তরে গিয়ে পৌছবে।'

আরেকটি হাদীসে এসেছে—

'যে ব্যক্তি শাসনকর্তার সামনে মিথ্যা কসম খেয়ে কোন মুসলমানের কোন জিনিস অবৈধভাবে নিয়ে নিল, তবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য দোযখের আগুন ওয়াজিব করে দিবেন। আর জান্নাত তার জন্য হারাম করে দিবেন। এটা শুনে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! যদিও তা তুচ্ছ কোন জিনিস হয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ হাঁ, যদিও তা জঙ্গলী কোন বৃক্ষের একটি ডালপালাই হোক না কেন।'

অন্য একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মামলাবাজকে সাবধান করতে গিয়ে ইরশাদ করেন—

'দেখ! যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে অন্য কারো কোন সম্পদ অবৈধ ভাবে আত্মসাৎ করে, কিয়ামতের দিন সে মহান আল্লাহ পাকের সামনে কুষ্ঠরোগী হয়ে উপস্থিত হবে।'

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'কেউ যদি এমন কোন জিনিসকে নিজের জন্য দাবী করে, অথচ তার মালিক সে নয়, এমন ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়।'

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান সম্পর্কে একটি হাদীসে এসেছে—

'একদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায শেষে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তিনি বিশেষ এক ভঙ্গিমায় তিনবার ইরশাদ করেন যে, মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান'কে শিরকের সমপর্যায়ের করে দেয়া হয়েছে।'

অবৈধ সম্পদের অপবিত্রতা ও তার ধ্বংসাত্মক পরিণতি ঃ

সম্পদ অর্জনের যেসব অবৈধ পন্থা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে, সেসব পন্থায় অর্জিত সব সম্পদই হারাম, অবৈধ এবং আবর্জনার মত নাপাক ও অপবিত্র। কেউ যদি এ সম্পদ থেকে জীবিকা নির্বাহ করে, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে ব্যবহার করে, রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে ইরশাদ করেন : 'তার নামায কবুল হবে না, দুআ কবুল করা হবে না, এমনকি যদি সে এ সম্পদ দ্বারা কোন কল্যাণকর কাজও সম্পাদন করে, তবুও তা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর পরকালে সে মহান আল্লাহর বিশেষ রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে। একটি হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যে ব্যক্তি (কোন অবৈধ পন্থায়) কোন হারাম সম্পদ অর্জন করবে, আর তদ্দ্বারা যদি সাদকা-খয়রাত করে, তার এ সাদকা কবুল করা হবে না। আর (নিজের প্রয়োজনে) তা থেকে যা কিছু ব্যয় করবে, তাতে কোন বরকত হবে না। আর যদি সে এমন মাল রেখে মৃত্যুবরণ করে, তবে তা তার জন্য জাহান্নামের ইন্ধন হবে। বিশ্বাস রাখ! আল্লাহ তাআলা মন্দকে মন্দ দ্বারা মুছে দেন না। (অর্থাৎ হারাম মালের সাদকা গুনাহ মাফের কারণ হতে পারে না।) বরং মন্দকে ভাল দ্বারা মুছে দেন। কোন নাপাকি অন্য নাপাকীকে মিটিয়ে দিয়ে তাকে পাক করতে পারে না।'

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'আল্লাহ তাআলা নিজে পবিত্র। তিনি পবিত্র ও হালাল সম্পদকেই কবুল করেন।'

অতঃপর হাদীসটির শেষাংশে তিনি এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন—

'যে দূর-দরায সফর করে কোন পবিত্র স্থানে এসে হাজির হন—এমন অবস্থায় যে, তার চুলগুলো এলোমেলো, আপাদমস্তক ধুলোয় ধূসরিত। আর আকাশের দিকে হস্তদ্বয় উত্তোলন করে খুব মর্মস্পর্শী চিত্তে দুআ করছে আর বলছে—হে আমার প্রতিপালক! হে আমার রব! কিন্তু তার খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা হারাম মাল থেকে হয়, তার পোশাকও হারাম থেকে, আর হারাম সম্পদ দিয়েই সে লালিত-পালিত হয়েছে। এমতাবস্থায় তার দুআ কিভাবে কবুল হবে? !'

অর্থ হল, যখন খাওয়া-দাওয়া সব হারাম মাল দ্বারা সম্পাদিত হয়, তখন তা দু'আ কবুলের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। অন্য এক হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যদি কোন ব্যক্তি, একটি কাপড় দশ টাকা দিয়ে ক্রয় করে, আর এই দশ টাকার এক টাকা অবৈধ পন্থায় উপার্জন করা হয়ে থাকে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ কাপড় তার শরীরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।'

আরেকটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যে শরীর হারাম সম্পদ দ্বারা লালিতপালিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'

ভাইয়েরা! আমাদের অন্তরে যদি অণু পরিমাণও ঈমান থাকে, তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব বাণী শুনে আমাদেরকে দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছা উচিত যে, যতই আমরা দুনিয়াতে অভাব-অনটন আর দুঃখ-কষ্টের জীবন যাপনের সম্মুখীন হই না কেন, কিছুতেই আমরা কোন অবৈধ ও হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা করব না। শুধু হালাল উপার্জনের উপরই সন্তুষ্ট থাকব।

হালাল উপার্জন ও সৎ ব্যবসায়ঃ

ইসলামে যেভাবে রোজগারের অবৈধ পন্থাকে হারাম এবং তা থেকে উপার্জিত অর্থকে অভিশপ্ত এবং নাপাক ঘোষণা করা হয়েছে, তেমনি বৈধ পন্থায় উপার্জন করা এবং সততার সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্য করারও বড়ই ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'হালাল পন্থায় জীবিকার সন্ধানও দ্বীনের অন্যান্য ফরযসমূহের পরই একটি ফরয।'

অন্য এক হাদীসে পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জনের মর্যাদা ও ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'কেউ তার উপার্জন এর চেয়ে উত্তম পন্থায় করতে পারবে না যে, স্বয়ং নিজ শক্তি ব্যয় করে এর জন্য কাজ করল। আল্লাহর নবী হযরত দাঊদ (আঃ)ও তা-ই করেছেন। তিনি নিজ হাতে কিছু কাজ করতেন এবং নিজের জীবিকা উপার্জন করতেন।'

অন্য এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'সততার সাথে এবং ঈমানদারীর সাথে ব্যবসাকারী বণিক (কিয়ামতের দিন) নবী, সিদ্দীক এবং শহীদদের সাথে থাকবে।'

লেনদেনে নরম পন্থা এবং দয়ার্দ্রতা অবলম্বন ঃ

লেনদেন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে সততা ও ঈমানদারীর প্রতি ইসলাম যেভাবে খুব জোর দিয়েছে। এটাকে উচ্চ পর্যায়ের সৎকাজ এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম ঘোষণা করেছে। ঠিক তেমনি এতদসংক্রান্ত কাজ-কারবার ও লেনদেনের ব্যাপারে নরম পন্থা অবলম্বন করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কঠোর পন্থা পরিহার করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'ঐ বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, যে বেচাকেনা ও অন্যের থেকে নিজের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে নরম পন্থা অবলম্বন করে।'

অন্য এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন—

'যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থকে (ঋণ আদায়ের ব্যাপারে) সময়ের ছাড় দেয় (অথবা পুরোপুরি বা অংশবিশেষ নিজের প্রাপ্য) ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিনের ভীষণ পেরেশানী থেকে পরিত্রাণ দান করবেন।'

অন্য বর্ণনায় এসেছে—

'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে স্বীয় রহমতের ছায়ায় স্থান দিবেন।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব বাণীর সম্পর্ক তো

ঐসব ধনাঢ্য ও ব্যবসায়ীদের সাথে, যাদের থেকে অভাবগ্রস্ত লোকেরা নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য ঋণ নিয়ে থাকে। কিন্তু যারা ঋণ নেয় তাদেরকে তিনি যথাশীঘ্র ঐ ঋণ পরিশোধের তাগীদ করেছেন। তারা যেন যথাসময়ে তাদের ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করবে। এমন যেন না হয় যে, সে ঋণী অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। আর আল্লাহর কোন বান্দার কোন হক তার যিম্মায় থেকে যায়। এ ব্যাপারে তিনি যে কঠোরতা করতেন তা তাঁর বাণীসমূহ থেকেই আন্দাজ করা যায়। যেমন একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'কেউ যদি আল্লাহর রাহে শাহাদত বরণ করে, তবে শহীদ হওয়ার দরুন তো তার সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। কিন্তু যদি তার কাছে কারো ঋণ থাকে, তবে শহীদ হয়েও সে তা থেকে নাজাত পাবে না।'

আরেকটি হাদীসে তিনি এরশাদ করেন—

'ঐ পালনকর্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জান রয়েছে! যদি কেউ আল্লাহর রাহে শহীদ হয়ে যায়, আবার জীবিত হয়, আবার শহীদ হয়, আবার জীবিত হয়, আবার শহীদ হয়, অথচ তাঁর কাছে অন্য কারো ঋণ বাকী থাকে, তবে (ঐ ঋণের ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত) সে জান্নাতে যেতে পারবে না।'

ধনসম্পদের আদান-প্রদান এবং বান্দার হকের পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য এ দু'টো হাদীসই যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এর পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন। আর আমরা সবসময় এই চেষ্টা করতে থাকব যেন আমাদের ঘাড়ে কারো কোন পাওনা থেকে না যায়।

সবক ঃ ৮

সামাজিক জীবনের বিধি-বিধান এবং পারস্পরিক অধিকার

সামাজিক জীবনের এবং পারস্পরিক অধিকার সংক্রান্ত শিক্ষাও ইসলামের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলোর অন্যতম। একজন মুসলমান তখনই পরিপূর্ণ ও সত্যিকার মুসলমান হিসেবে গড়ে উঠবে, যখন সে ইসলামের সামাজিক বিধি-বিধান পুরোপুরি অনুসরণ করবে।

সামাজিক বিধি-বিধান বলতে, পারস্পরিক আচার-ব্যবহারগত ঐসব নিয়ম-নীতি বুঝানো হয়েছে, যা ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে। যেমন, সন্তানের স্বীয় পিতামাতার সাথে, পিতামাতার আচার-ব্যবহার তাদের সন্তানদের সাথে সম্পর্ক ও ব্যবহার, এক ভাইয়ের সম্পর্ক তাঁর অন্য ভাইদের সাথে, বোনের সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আচার-অনুষ্ঠান, ছোটদের সম্পর্ক বড়দের সাথে, বড়দের সম্পর্ক ছোটদের সাথে, ব্যক্তির সম্পর্ক তার প্রতিবেশীর সাথে, ধনীর সম্পর্ক গরীবদের সাথে, অফিসারের সম্পর্ক তাঁর অধীনস্তদের সাথে, চাকুরীজীবীদের সম্পর্ক তাদের অফিসারদের সাথে কেমন হবে? মোটকথা, পার্থিব জীবনে বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর ছোট-বড় যেসব লোকেদের সাথে আমাদের মেলামেশা হয়ে থাকে, তাদের সাথে আমাদের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে ইসলাম আমাদেরকে যে আদর্শ সংস্কৃতি এবং একটি নির্ভুল ও পরিপূর্ণ বিধি-বিধান উপহার দিয়েছে, সেই অনন্য ও অতুলনীয় আদাবকেই সামাজিক বিধি বিধান বলা হয়। এ অধ্যায়ে আমরা এসব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।

পিতামাতার অধিকার ঃ

এ দুনিয়ায় মানুষের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গাঢ় সম্পর্ক তাঁর পিতামাতার সাথে হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলার অধিকারের পরপরই সর্বাগ্রে পিতামাতার অধিকারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا.

'তোমার পালনকর্তা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কাঁরো ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উহ্ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ ভদ্রজনোচিত কথা বল। তাদের সামনে দয়ার বাহু প্রসারিত করে দাও এবং বল ঃ হে আমার প্রতিপালক ! তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।' (সূরা বনী ইসরাঈল ২৩-২৪)

কুরআনে কারীমের অন্য এক আয়াতে পিতামাতার অধিকার বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ তাআলা এ পর্যন্ত ইরশাদ করেন—

وَاِنْ جٰهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا.

'যদি কারো মা-বাপ কাফির-মুশরিকও হয় এবং সন্তানকে কুফর-শিরকের দিকে বাধ্যও করে, তবে সন্তানের উচিত, তাদের কথায় কুফর বা শিরক তো করবে না, কিন্তু জীবদ্দশায় তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং তাঁদের যথাযথ খেদমত করতে থাকবে।' (সূরা লুকমান)

কুরআনে কারীম ছাড়াও হাদীস শরীফেও পিতামাতার খিদমত ও আনুগত্যের প্রতি ভীষণ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাদের সাথে বেআদবী এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়াকে বড় গুনাহর কাজ বলে অভিহিত করা

হয়েছে।

একটি হাদীসে এসেছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'পিতামাতার সন্তুষ্টি মূলত আল্লাহ তাআলারই সন্তুষ্টি। আর পিতামাতার অসন্তুষ্টি মূলত আল্লাহ তাআলারই অসন্তুষ্টি।'

অন্য এক হাদীসে এসেছে—

'এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, সন্তানের কাছে পিতামাতার কী অধিকার রয়েছে? নবীজী ইরশাদ করেন ঃ সন্তানের জান্নাত ও দোযখ তার পিতামাতার উপর নির্ভরশীল।'

অর্থাৎ তাদের খেদমত করলে জান্নাত পাওয়া যাবে। আর তাঁদের অবাধ্য হলে, তাঁদের সাথে দুর্ব্যবহার করলে দোযখে যেতে হবে।

আরো একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান—

'পিতামাতার একান্ত বাধ্যগত ও খিদমতগার সন্তান যতবার মুহাব্বত ও সম্মানের দৃষ্টিতে তার পিতামাতার চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করবে, আল্লাহ তাআলা প্রতিবার দৃষ্টিপাত করার বিনিময়ে একটি মকবুল হজ্জের সওয়াব তার নামে লিখে দেন। সাহাবারা (রাযিঃ) প্রশ্ন করেন, হযরত! যদি সে প্রতিদিন একশো' বার দেখে, তবুও কি প্রতিবারের বিনিময়ে একটি মকবুল হজ্জের সওয়াব লাভ করবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—হাঁ, আল্লাহ অনেক বড়! অনেক পবিত্র! অর্থাৎ তার কাছে কোন কিছুর অভাব নেই, তিনি যে কাজের বিনিময়ে যে টুকুন সওয়াব দিতে চান, তা তিনি দিতে পারেন।'

একটি হাদীসে এসেছে—

'পিতামাতার পদতলে সন্তানের বেহেশত।'

একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)কে সর্বপ্রহৎ গুনাহ চিহ্নিত করে ইরশাদ করেন—

'আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা।'

অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'তিন ধরনের লোকদের প্রতি মহান আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন দয়ার দৃষ্টিতে দেখবেন না, তন্মধ্যে এক ধরনের লোক হল, যারা পিতামাতার অবাধ্য।'

সন্তানের অধিকার ঃ

ইসলাম যেভাবে সন্তানের কাছে পিতামাতার অধিকার রেখেছেন, ঠিক তেমনি পিতামাতার কাছেও সন্তানের অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাদের খাদ্য, বস্ত্র ও লালন-পালন সংক্রান্ত আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। কারণ, সন্তানের এ অধিকারের অনুভূতি সৃষ্টিগতভাবেই প্রত্যেক পিতামাতার মধ্যে রয়েছে। তবে সন্তানের যেসব অধিকার প্রদানে সাধারণত আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে, তাহল, তাদের ধর্মীয় ও চরিত্রগত সঠিক লালন-পালন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের প্রতি ফরয করেছেন যে, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে এমন শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করব, যাতে করে সে মৃত্যুর পর দোযখে না যায়। কুরআনের ঘোষণা—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেরা নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।' (সূরা তাহরীম)

সন্তানদেরকে উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার ফযীলত সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেন—

'পিতার পক্ষ থেকে সন্তানের প্রতি এর চেয়ে উত্তম উপহার আর কী হতে পারে! যে পিতা তার সন্তানদেরকে উত্তম শিক্ষা-দীক্ষায় গড়ে তোলেন।'

অনেক লোক তাদের সন্তানদের মধ্যে পুত্র সন্তানের প্রতি বেশী ভালবাসা এবং আকর্ষণ থাকে। আর কন্যা সন্তানকে নিজের জন্য বোঝা

মনে করে। ফলে তাদের দেখাশোনা এবং উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে অনিহা প্রদর্শন করে। এ জন্য ইসলাম কন্যা সন্তানদের উত্তম লালন-পালন এবং উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এর প্রতিদান স্বরূপ বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করেছে। একটি হাদীসে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যার কোন কন্যা সন্তান বা বোনেরা আছে এবং সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাদেরকে উত্তম শিক্ষা-দীক্ষায় গড়ে তোলে, আর তাদেরকে উপযুক্ত পাত্রের সাথে বিবাহ সম্পাদন করে, তবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত প্রদান করবেন।'

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ঃ

মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। এতদুভয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত সুনীনিড় এবং খুব কাছের। এজন্য ইসলাম তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারেও অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং গুরুত্ববহ পথনির্দেশনা প্রদান করেছে। এ সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষার সারাংশ হল, স্ত্রীর উচিত, সে যেন তার স্বামীর পরিপূর্ণ একজন হিতাকাংখী হয়ে তার আনুগত্য করে। আর তার আমানতে কোন ধরনের খিয়ানত না করে।

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ.

'সৎকর্মশীলা নারীরা আনুগত্যশীল হয়। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ করে।' (সূরা নিসা)

আর স্বামীদের প্রতি ইসলামের নির্দেশ হল, সে যেন তার স্ত্রীকে পরিপূর্ণভাবে ভালবাসে, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে উত্তম ভরণপোষণ প্রদান করে। আর তার মনোরঞ্জনের প্রতি দৃষ্টি দিবে।

ইরশাদে এলাহী—

وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর।' (সূরা নিসা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনী শিক্ষা মোতাবেক মুসলমান পুরুষদেরকে এবং নারীদেরকে পারস্পরিক সদাচার এবং একে অপরকে সন্তুষ্ট রাখার প্রতি খুব তাগিদ করতেন। এ ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস এখানে সন্নিবেশিত হল।

একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন—

'যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজের কাছে ডাকে আর স্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করে, আর রাতে সে তার স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে, তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ ঐ স্ত্রীর প্রতি অভিশাপ দিতে থাকে।'

পক্ষান্তরে অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যে নারী এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, তবে সে জান্নাতবাসী হবে।'

অন্য এক হাদীসে এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান—

'ঐ মহান সত্তার কসম, যার কুদরতী হাতে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রাণ। কোন নারী ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার হক আদায় করতে পারবে না, যতক্ষণ সে তার স্বামীর অধিকার প্রদান না করবে।'

একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মুসলমানদের বিশাল এক সমাবেশে বিশেষভাবে পুরুষদেরকে উদ্দেশ্য করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'আমি তোমাদেরকে নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছি। তোমরা আমার এ উপদেশকে স্মরণ রাখবে। দেখো তারা তোমাদের আয়ত্তাধীন এবং তোমাদের ক্ষমতাধীন।'

আরেকটি হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'তোমাদের মধ্যে সে-ই ভাল, যে তার স্ত্রীর কাছে ভাল।'

অন্য এক হাদীসে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন —

'মুসলমানদের মধ্যে পূর্ণ ঈমানদার ঐ ব্যক্তি, যার চরিত্র ভাল। আর তার স্ত্রী-পরিজনদের সাথে তার আচার-আচরণ নরম ও ভালবাসাপূর্ণ।'

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ঃ

পিতামাতা, ছেলেমেয়ে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছাড়াও মানুষের আরো বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে। ইসলাম এই সম্পর্ককেও অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছে। আর এ ব্যাপারে কিছু পারস্পরিক অধিকারের কথা ঘোষণা করেছে। কুরআনে কারীমের জায়গায় জায়গায় ذَوِى الْقُرْبٰى (আত্মীয়-স্বজন)-এর সাথে উত্তম ব্যবহারের তাগিদ করা হয়েছে। ইসলাম ঐ ব্যক্তিকে ভীষণ বড় অপরাধী এবং মহাপাপী বলে অভিহিত করেছে, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং তাদের অধিকারকে পদদলিত করে। একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার নষ্টকারী এবং আচার-ব্যবহারে আত্মীয়তার প্রতি অবহেলা প্রদর্শনকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'

এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যময় শিক্ষা হল, তিনি নেহাত তাগিদের সাথে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদিও তোমাদের কোন আত্মীয় তোমাদের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তবুও তোমরা তাদের আত্মীয়তার অধিকার প্রদানে কুণ্ঠিত হয়ো না।

ইরশাদে রাসূল—

'তোমাদের যে প্রিয় আত্মীয় তোমাদের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখে না এবং অসদাচরণ করে, আর আত্মীয়তার অধিকার নষ্ট করে, তবুও তোমরা তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করো না। তোমরা তোমাদের যথাযথ সম্পক বজায় রেখে চল।'

صل من قطعك...

'যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে দাও।'

ছোটদের প্রতি বড়দের এবং বড়দের প্রতি ছোটদের অধিকার ঃ

ইসলামে সামাজিকতার ব্যাপারে একটি সাধারণ ও মৌলিক এ শিক্ষাও দিয়েছে যে. বয়সে ছোটরা তাদের বড়দেরকে ইজ্জত-সম্মান করবে। তাদের সাথে অত্যন্ত আদবের সাথে চলবে। আর বড়দের উচিত, তারা তাদের ছোটদেরকে মুহাব্বত ও দয়াদ্রতার সাথে আচরণ করবে। যদিও তাদের মাঝে আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক না থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে ঘোষণা করেন—

'বড়রা যদি তাদের ছোটদের প্রতি দয়ার্দ্র না হয়. আর ছোটরা যদি বড়দের সাথে আদব-কায়দা বজায় না রাখে, তাহলে তারা আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।'

অন্য এক হাদীসে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যে যুবক কোন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে তার চেয়ে বড় হওয়ার দরুন সম্মান প্রদর্শন করবে, তবে আল্লাহ তাআলা তার জন্যও এমন লোক তৈরী করে দেবেন, যারা তার বৃদ্ধকালীন সময়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করবে।'

প্রতিবেশীর অধিকার ঃ

নিজের আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও মানুষের একধরনের আত্মিক সম্পর্ক তার প্রতিবেশীদের সাথে গড়ে ওঠে। ইসলাম এক্ষেত্রে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। আর এ ব্যাপারে বিস্তারিত পথনির্দেশনার একটি আলাদা অধ্যায়ের সূচনা করেছে। কুরআনে কারীমে যেখানে পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচরণ এবং সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে,

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচরণ এবং সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে প্রতিবেশীদের ব্যাপারেও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে—

وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ.

এ আয়াতে তিন ধরনের প্রতিবেশীদের আলোচনা করা হয়েছে। এর প্রত্যেক প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১. [وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى] দ্বারা ঐ প্রতিবেশীকে বুঝানো হয়েছে, যারা প্রতিবেশী অথচ তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও রয়েছে।

২. [وَالْجَارِ الْجُنُبِ] দ্বারা ঐ প্রতিবেশীকে বুঝানো হয়েছে, যাদের সাথে অন্য কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই, তারা শুধু প্রতিবেশী। যাদের মধ্যে অন্য ধর্মাবলম্বীরাও শামিল রয়েছে।

৩. [وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ] দ্বারা তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা অস্থায়ী প্রতিবেশী। যেমন, সফরের সাথী, মাদরাসা-বিদ্যালয়ের সাথী, কর্মস্থলের সহকর্মী ইত্যাদি। এক্ষেত্রেও মুসলমান ও অমুসলমান সবাই সমান।

এই তিন ধরনের প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আচার-ব্যবহারের নির্দেশ ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে। প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ের প্রতি এতো গুরুত্ব দিতেন যে, একটি হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন—

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কোন ধরনের দুঃখ-কষ্ট না দেয়।'

অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'ঐ ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুসলমান নয়, যে নিজে পেটভরে খায় আর

তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।' (তার খবর নেয় না)

অন্য এক হাদীসে এসেছে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ ভাবগম্ভীর কণ্ঠে ইরশাদ করেন—

'আল্লাহর কসম! সে প্রকৃত মুমিন নয়, আল্লাহর কসম! সে প্রকৃত মুমিন নয়, আল্লাহর কসম! সে প্রকৃত মুমিন নয়, জিজ্ঞাসা করা হলো, হুযূর! কে প্রকৃত মুমিন নয়? ইরশাদ করেন ঃ ঐ ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়, যার অনিষ্টতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।'

অন্য এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্টতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।'

আরেকটি হাদীসে এসেছে—

'জনৈক সাহাবী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হুযূর! একজন মহিলার ব্যাপারে শোনা যায় যে, সে খুব নামায আদায় করে, বেশি বেশি রোযা রাখে, মুক্তহস্তে আল্লাহর রাহে দান-খয়রাত করে, কিন্তু সে তার কঠোর বাক্য দ্বারা তার প্রতিবেশীকে কষ্টও দিয়ে থাকে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সে দোযখের পথিক। অতঃপর একই সাহাবী (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অন্য এক মহিলার ব্যাপারে শোনা যায় যে, সে নামায, রোযা, দান-খয়রাত খুব বেশি করে না, (অর্থাৎ নফল নামায,নফল রোযা এবং নফল দান-খয়রাত প্রথম মহিলার চেয়ে কম করে) কিন্তু তিনি তার প্রতিবেশীকে কোন কষ্ট দেন না। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ সে জান্নাতে যাবে।'

ভাইয়েরা! ইসলামে এটাই হলো, প্রতিবেশীর অধিকার। হায় আফসোস! আমরা আজ ইসলামের এই মহান শিক্ষা থেকে কতই না দূরে অবস্থান করছি।

দুর্বল ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার

এতক্ষণ তো সমাজের ঐ শ্রেণীর লোকদের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো, যাদের মাঝে পারস্পরিক বিভিন্ন সম্পর্ক ও সম্বন্ধ রয়েছে। চাই আত্মীয় হোক বা প্রতিবেশী হোক বা হোক কোন ক্ষণস্থায়ী সহযাত্রী। কিন্তু ইসলাম এদের ছাড়াও সমাজের দুর্বল ও অভাবগ্রস্ত মানুষের কথা ভুলে যায়নি। তাদের জন্যও যথোপযুক্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। সমাজের উঁচু শ্রেণীর সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের প্রতি কর্তব্য আরোপ করা হয়েছে, যেন তারা সমাজের বঞ্চিত দুর্বল ও অভাবগ্রস্ত মানুষগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখে। তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নিজেদের যোগ্যতা ও সম্পদের মাঝে তাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের অংশ তাদের হাতে যেন পৌঁছে দেয়। পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় এর গুরুত্ব তুলে ধরে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে—এতীম, দরিদ্র, ফকির, মুসাফির এবং অন্যান্য অভাবগ্রস্ত লোকেদের খেদমত কর, ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দাও, বস্ত্রহীনদের গায়ে তাদের প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদের ইন্তেজাম করো, ইত্যাদি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ ব্যাপারে উম্মতকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উৎসাহিত করেছেন। আর এর অনেক ফযীলত ও পুরস্কারের কথা বর্ণনা করেছেন। এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস এখানে সন্নিবেশিত হলো। একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটো আঙ্গুল একত্রিত করে ইরশাদ করেন—

> 'কোন এতিম শিশুর অভিভাবকত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি জান্নাতে আমার এমনই কাছাকাছি থাকবে, যেমন এই দুটো আঙ্গুল একত্রিত হয়ে মিলে আছে।'

অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

> 'বিধবা নারী, দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্তদের প্রতি লক্ষ্যকারী এবং তাদেরকে সাহায্যের জন্য চেষ্টাকারী মানুষেরা আল্লাহর রাহে জিহাদকারীদের শ্রেণীভুক্ত এবং সওয়াবের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির

সমতুল্য যে সর্বদা দিনের বেলা রোযা রাখে আর রাত অতিবাহিত করে নামাযে দণ্ডায়মান থেকে।'

অন্য একটি হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেন—

'যারা ক্ষুধার্ত তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করো, রোগাক্রান্তদের খবরাখবর নাও, বন্দীদেরকে মুক্ত করে দাও।'

আরেকটি হাদীসে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করেন। এর সাথে এ–ও ইরশাদ করেন—

'বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করো এবং পথভোলাদেরকে রাস্তার সন্ধান দাও।'

এসব হাদীসে যেসব কল্যাণকর কাজ সম্পাদন করার নির্দেশ মুসলমানদেরকে দেয়া হয়েছে তাতে মুসলিম–অমুসলিমের কোন বাছবিচার নেই। সবার জন্যই এসব কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমনকি কোন কোন হাদীসে তিনি জন্তুজানোয়ারের সাথেও সদাচরণের ভীষণ তাগিদ দিয়েছেন। বোবা জানোয়ারের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাদের যথাযথ খেদমত আঞ্জামদাতা লোকদেরকে মহান আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির সুসংবাদ শুনিয়েছেন।

ইসলাম আসলেই পুরো বিশ্ব এবং তাবৎ সৃষ্টির জন্য রহমত স্বরূপ। আর আমাদের দিশারী এবং মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তো 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' (জগতসমূহের জন্য রহমত)। কিন্তু আমরা তাঁর শিক্ষা ও পয়গাম থেকে দূরে সরে পড়েছি। হায়! এমন যদি হতো, আমরাও সত্যিকার মুসলমান হয়ে এ পৃথিবীর জন্য রহমত স্বরূপ বনে যেতাম।

এক মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমানের অধিকার

আত্মীয়তা, প্রতিবেশী আর সাধারণ মানবাধিকার ছাড়াও প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমান ভাইয়েরও দ্বীনী অধিকার রয়েছে। এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস এখানে সন্নিবেশিত হলো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'প্রত্যেক মুসলমান একে অপরের ভাই। প্রত্যেকের জন্য জরুরী যে, কেউ কারো উপর জুলুম-অত্যাচার করবে না। আর যদি অন্য কেউ তার উপর জুলুম করে, (তবে একে) অপরকে একলা ছেড়ে যেন চলে না যায়। (বরং সম্ভব হলে তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে এবং সাথে থাকবে) তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার নিজের ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাতে লেগে থাকবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজন মেটাতে লেগে থাকবেন। আর যে মুসলমান অন্য মুসলমান ভাইয়ের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেবে, প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের কঠিন দিবসে তার কোন কষ্ট দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি অন্য মুসলমান ভাইকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকেও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন।'

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না। শত্রুতা রেখো না, গীবত করো না। আর এক আল্লাহর বান্দা হয়ে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে মজবুত করে নাও। কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার অন্য মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিনদিনের বেশি সময় সালাম-কালাম ত্যাগ করে থাকবে।'

আরেকটি হাদীসে পিয়ারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'এক মুসলমানের জানমাল এবং ইজ্জত-আবরু (নষ্ট করা) অন্য মুসলমানের জন্য হারাম।'

সামাজিক রীতি-নীতি এবং পারস্পরিক অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা প্রিয়নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন একটি হাদীস দ্বারা শেষ করতে যাচ্ছি, যা প্রতিটি মুসলমানকেই আলোড়িত করবে।

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা! বলতো দরিদ্র ও

রিক্তহস্ত কে? সাহাবীরা (রাযিঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী! দরিদ্র ঐ ব্যক্তি যার কাছে টাকা-পয়সা নেই। নবীজী বললেন ঃ না, আমাদের মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তি সে-ই, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, সদকা-খয়রাতের ভাণ্ডার নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু দুনিয়াতে সে কাউকে গালিগালাজ করেছিল, কাউকে অপবাদ দিয়েছিল, কাউকে মারপিট করেছিল, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল। যখন তাকে হিসাব নেয়ার জন্য দাঁড় করানো হবে, তখন তার ঐসব দাবীদার লোকেরা এসে জড়ো হবে আর তাদের প্রাপ্য পরিমাণ তার সওয়াব থেকে তাদেরকে পরিশোধ করা হবে। এমনকি একসময় তার সব সওয়াব শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর ঐ দাবীদারদের গুনাহসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'

ভাইয়েরা! এই হাদীসটির ব্যাপারে চিন্তা করুন যে, অন্যের অধিকার হরণ করা, কাউকে মন্দ বলা, কারো গীবত করার দ্বারা নিজে নিজেকে কি পরিমাণ ধ্বংসের দিকে ধাবিত করা হচ্ছে! যদি কেউ কারো অধিকার হরণ করে থাকে তবে দুনিয়াতেই তা মিটমাট করে নেয়া উচিত। হয় তার বিনিময় প্রদান করুন অথবা তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন। এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধানতার দৃঢ় অঙ্গীকার করুন নতুবা পরকালে এর পরিণতি হবে ভীষণ ভয়াবহ। (হে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন)

সবক ঃ ৯

সচ্চরিত্র

সচ্চরিত্র ও সদগুণাবলীর শিক্ষাও ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। মানুষের চারিত্রিক ও আত্মিক সংশোধনের মহতোদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী করে প্রেরণ করা হয়েছে। স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'আমি মানুষদেরকে উন্নত চরিত্রের শিক্ষা দিয়ে এক্ষেত্রে তাদেরকে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি।'

সচ্চরিত্রের গুরুত্ব ও ফযীলত

ইসলামে সচ্চরিত্রের গুরুত্ব কতটুকু এবং এর ফযীলত কী? এ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নবর্ণিত হাদীসগুলো থেকে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক সে-ই, যে সচ্চরিত্রবান।'

অন্য এক হাদীসে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'কিয়ামতের দিন আমার কাছে ঐ ব্যক্তি সর্বাধিক প্রিয়, যার চরিত্র ভালো।'

আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'কিয়ামতের দিন আমলের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী আমল হবে 'সচ্চরিত্র'।'

অন্য এক হাদীসে এসেছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মানুষের কোন্ গুণ তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে? জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'আল্লাহর ভয় এবং উত্তম চরিত্র।'

অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী মুমিনকে সারাদিন রোযা ও সারারাত নামাযের সওয়াব প্রদান করা হয়।'

অর্থ হলো, আল্লাহর যে বান্দা মুমিন, সে আল্লাহ তাআলার দেয়া ফরয বিধানগুলো যথাযথ পালন করে, খুব বেশি নফল রোযা-নামায আদায় করে না কিন্তু সে সচ্চরিত্রবান। তবে আল্লাহ তাআলা তার এ সচ্চরিত্রের দরুন ঐসব ওলীআল্লাহদের সমপরিমাণ সওয়াব তাকে দান করবেন, যারা (صائم النهار و قائم الليل) পুরো দিনে রোযা এবং পুরো রাতে নফল নামায পালনকারী।

অসচ্চরিত্রের পরিণাম

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে সচ্চরিত্রের পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, তেমনি অসচ্চরিত্রের ভয়াবহ পরিণাম থেকেও আমাদেরকে সাবধান করেছেন।

একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'অসচ্চরিত্রবান লোক জান্নাতে যেতে পারবে না।'

অন্য এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'মহান আল্লাহ তাআলার কাছে অসচ্চরিত্র থেকে খারাপ আর কিছু নেই।'

কতক সচ্চরিত্রের বর্ণনা

এমনিতে তো কুরআন হাদীসে ভালো সব চরিত্র এবং অমূল্য আত্মিক গুণাবলীর শিক্ষা দেয়া হয়েছে, আর সমূহ খারাপ চরিত্র ও বদঅভ্যাস থেকে বাঁচার প্রতি জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে, কিন্তু এখানে আমরা অত্যন্ত জরুরী ইসলামী আদর্শ কয়েকটি চারিত্রিক গুণাবলীর

পথনির্দেশনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করবো, যেসব গুণে গুণান্বিত না হলে প্রকৃত মুসলমানই হওয়া যায় না।

সততা এবং সত্যবাদিতা

ইসলামে সততার ব্যাপারে এতই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক মুসলমানকে সদসর্বদা সত্য কথা বলা ছাড়াও এর প্রতি ভীষণ তাগিদ করা হয়েছে যে, ব্যক্তি যেন সবসময় সততার সাথে সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন করে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ.

'হে ঈমানদারেরা! আল্লাহকে ভয় করো, আর শুধু সত্যবাদীদের সাথে থাকো।'

হাদীসে শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন—

'যে চায় যে, আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার ভালোবাসা হোক বা আল্লাহ ও রাসূল তাকে ভালোবাসুন, তবে তার জন্য অত্যাবশ্যকীয় হলো, যখনই সে কথা বলবে তখন যেন সত্য কথা বলে।'

অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'সততা অবলম্বন করো, যদিও তাতে তোমাদেরকে চরম ধৈর্যও ধরতে হয় এবং মৃত্যুরও মুখোমুখী হতে হয়। কেননা সততার মাঝেই জীবন ও মুক্তি নিহিত রয়েছে। মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো, যদিও দৃশ্যত তার মাঝে মুক্তি ও সফলতা দৃষ্টিগোচর হয়। কেননা, মিথ্যার পরিণতি দুঃখ-কষ্ট এবং ব্যর্থতা।'

একটি বর্ণনায় এসেছে, কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো যে, জান্নাতবাসীদের পরিচয় কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—সত্য কথা বলা।

পক্ষান্তরে অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইরশাদ করেন—

'মিথ্যা বলা মুনাফেকের পরিচিতিমূলক অভ্যাস।'

অন্য এক হাদীসে এসেছে—

'কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ মুমিন কি ভীতু হতে পারে? ইরশাদ করেন ঃ হাঁ। আবার প্রশ্ন করা হলো ঃ মুমিন কি কৃপণ হতে পারে? ইরশাদ করেন ঃ হাঁ। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ মুমিন কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? ইরশাদ করেন ঃ না।' (অর্থাৎ ঈমান ও মিথ্যা দুটো বিপরীতমুখী গুণ)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সদাসর্বদা সত্য অবলম্বনের তাওফীক দান করুন। যা মানুষকে মুক্তি দিতে পারে, জান্নাতের পথ সুগম করতে পারে। আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রিয় বানিয়ে দেয়। আর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন, যার পরিণাম ধ্বংসাত্মক ও যন্ত্রণাদায়ক, যদ্দরুন মানুষ আল্লাহ ও রাসূলের অভিশাপ এবং অসন্তুষ্টির বোঝা বহন করে, যা মুনাফেকের পরিচিতি।

অঙ্গীকার পূর্ণ করা

এটাও মূলত সততারই একটি প্রকার। কারো সাথে যদি কোন অঙ্গীকার বা ওয়াদা করা হয় তা পূর্ণ করা উচিত। কুরআন হাদীসে বিশেষভাবে এর প্রতি পথনির্দেশ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا .

'আর তোমরা নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ করো। নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমাদের কাছে তোমাদের প্রত্যেক অঙ্গীকার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।' (সূরা বনী ইসরাঈল)

কুরআন মজীদের অন্যত্র সৎকর্মশীলদের সৎকাজের আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে—

وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا

'আর আল্লাহর কাছে সৎকর্মশীল তারাই যারা তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে।' (সূরা বাকারাহ)

হাদীসে এসেছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অধিকাংশ খুৎবায় (বক্তৃতায়) ইরশাদ করতেন—

'যে ব্যক্তি নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করে না, ধর্মে তার কোন অংশ নেই।'

অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'অঙ্গীকার ভঙ্গ করা মুনাফেকের বৈশিষ্ট্য।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী মোতাবেক বুঝা যাচ্ছে যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, ওয়াদার বরখেলাফ করা বা চুক্তি ভঙ্গ করা—এসব ঈমানের সাথে একত্রিত হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা এসব বদঅভ্যাস ও অসচ্চরিত্র থেকে আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন। আমীন!

আমানতদারী

আমানতদারীও সততার একটি প্রকার। ইসলাম এর প্রতিও বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। কুরআনে করীমে ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا.

'আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমানতসমূহ সঠিকভাবে প্রাপককে পৌছে দাও।'

কুরআন মজীদের দুটো জায়গায় প্রকৃত ঈমানদারদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে—

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ.

'ঐসব লোক যারা আমানতসমূহ এবং অঙ্গীকারসমূহের সুসংরক্ষণ করে। (অর্থাৎ আমানত যথাস্থানে পৌছে দেয় এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করে।)' (সূরা মুমিনুন ও সূরা মাআরিজ)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অধিকাংশ বক্তৃতায় মিম্বরে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করতেন—

'হে লোকসকল! যার মধ্যে আমানতদারীর গুণ নেই, তার মধ্যে যেন ঈমানই নেই।'

একটি হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'কারো সৎকর্মশীলতার আন্দাজ করার জন্য শুধু তার নামায, রোযা দেখেই ক্ষান্ত হয়ো না। বরং আরো দেখো যে, সে সত্য কথা বলে কিনা? প্রকৃত আমানতদার কিনা? দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের সময়ও সে তাকওয়া আঁকড়ে ধরে থাকে কিনা?'

প্রিয় ভাইয়েরা! আমরা যদি মহান আল্লাহ তাআলার কাছে প্রকৃত মুমিন হতে চাই এবং তাঁর রহমতের উপযুক্ত হতে চাই, তবে প্রত্যেক কাজেকর্মে আমানতদারী ও সততা অবলম্বন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করাকে আমাদের জীবনের নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের যার মাঝে এসব গুণাবলী বিদ্যমান থাকবে না, সে আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে স্বীকৃত হবো না।

ন্যায়পরায়ণতা

ইসলাম প্রত্যেক কাজকর্মে ন্যায়পরায়ণতার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ.

'আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।'

ইসলামের নির্দেশিত এই ন্যায়পরায়ণতা শুধু নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে বলা হয়নি, বরং অন্যের ক্ষেত্রেও এবং জানমাল, ঈমান ও ধর্মের দুশমনদের ক্ষেত্রেও এই ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করার জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে।

কুরআনে করীমে স্পষ্টভাবে ইরশাদ হয়েছে—

وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى.

'আর কোন গোষ্ঠীর শত্রুতা তোমাদেরকে যেন ন্যায়পরায়ণতা পরিহারের গুনাহে লিপ্ত না করে দেয়। তোমরা সর্বাবস্থায় সকলের সাথে ন্যায়পরায়ণ থাকো। এটাই তাকওয়ার নিকটবর্তী।' (সূরা মায়িদা)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে যদিও আমাদের কোন শত্রুতা বা যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়, তবুও আমরা তাদের সাথে এমন অসদাচরণ করতে পারবো না যদ্দ্বারা মানবাধিকার লংঘিত হয়। আর যদি কেউ এমনটি করে, তবে সে আল্লাহ তাআলার কাছে ভীষণ গুনাহগার ও অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক নৈকট্য লাভকারী এবং প্রিয় হবে ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান। (অর্থাৎ আল্লাহর বিধানানুযায়ী ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী) আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে থাকবে এবং কঠিন শাস্তি ভোগ করবে জালিম রাষ্ট্রনায়ক (অর্থাৎ অন্যায় আর জুলুমের রাজত্ব কায়েমকারী রাষ্ট্রপ্রধানেরা।)'

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন—

'তোমরা কি জান, কিয়ামতের দিন কারা সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার রহমতের ছায়ায় অবস্থান নেবে? বলা হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ভাল জানেন। প্রিয়নবী ইরশাদ করেন ঃ এরা ঐসব আল্লাহর বান্দা, যাদের অবস্থা এমন হবে যে, যখন তাদেরকে নিজেদের অধিকার হস্তান্তর করা হয়, তখন তারা তা গ্রহণ করে, আর যখন তাদের কাছে অন্যের অধিকার তলব করা হয়, তখনও তারা নির্দ্বিধায়

ওদের অধিকার প্রদান করে। অন্যের ব্যাপারে ঠিক একই রকম বিচার ফয়সালা করে, যে ফয়সালা সে নিজের জন্য সাব্যস্ত করে। (অর্থাৎ নিজের ও অন্যের মধ্যে কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না।)'

আফসোস! আমরা মুসলমানগণ ইসলামের এসব আদর্শ শিক্ষাগুলো একেবারে ভুলেই গিয়েছি। আজও যদি মুসলমানদের মধ্যে আবার এসব গুণাবলী ফুটে ওঠে, তারা সত্যবাদী হয়ে যায়, অঙ্গীকার পূর্ণকারী বনে যায়, সমাজে আমানতদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে আর প্রত্যেকের সাথে ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করতে থাকে, তবে দুনিয়া আবার তাদেরকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করবে এবং জান্নাতেও তারা উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হবে।

দয়া ও ক্ষমানুভূতি

কারো বিপদাপদে ও দুঃখ-দুর্দশায় সহানুভূতিশীলচিত্তে তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা এবং কারো ত্রুটি দেখে ক্ষমার দৃষ্টিতে তাকে দেখা, এটাও উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। ইসলাম এর প্রতিও গুরুত্বারোপ করেছে এবং এ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'তোমরা আল্লাহ তাআলার বান্দাদের প্রতি দয়ার্দ্র হও, তোমাদের প্রতিও দয়া প্রদর্শন করা হবে। তোমরা লোকেদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও, তোমাদের ভুল-ত্রুটিও ক্ষমা করে দেয়া হবে।'

অন্য এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যে অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র হয় না, তাকেও দয়া প্রদর্শন করা হবে না।'

অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'দয়া প্রদর্শনকারীদের প্রতি রহমান (আল্লাহ) দয়া প্রদর্শন করেন।

তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়ার্দ্র হও। আসমানওয়ালা তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হবেন।'

এ হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে, ইসলাম শত্রুমিত্র সকলের প্রতি এমনকি পৃথিবীতে বসবাসকারী সমগ্র সৃষ্টির প্রতি দয়ার শিক্ষা দেয়। একটি হাদীসে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'এক ব্যক্তি একটি পিপাসাকাতর কুকুরকে কাঁদা চাটতে দেখে তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে পানি পান করিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তার এ কাজের বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করে দেন।'

আফসোস! আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সকলের সাথে সহানুভূতির গুণ আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে। যার জন্য আমরাও আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিতই হয়ে চলেছি।

কোমল ব্যবহার

পারস্পরিক আচার-আচরণ, লেনদেন ইত্যাদিতে সহজ সরল ও কোমল ব্যবহার প্রদর্শন করাও ইসলামের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আদর্শ শিক্ষাগুলোর অন্যতম। একটি হাদীসে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'সহজ সরল ও কোমল আচরণ প্রদর্শনকারীদের জন্য দোযখের আগুন হারাম করে দেয়া হয়েছে।'

অন্য এক হাদীসে এসেছে—

'আল্লাহ তাআলা নিজে কোমল আচরণ করেন। তিনি কোমলতাকে পছন্দ করেন। কোমলতার বিনিময়ে এতই দান করেন, যা কঠিন ব্যবহারের বিনিময়ে দেন না।'

সহ্য ও সহিষ্ণুতা

অপছন্দনীয় ব্যাপার সহ্য করা এবং তখন রাগকে হজম করা ইসলামের আরেকটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শিক্ষা। ইসলাম চায় প্রতিটি মানুষের মধ্যে এ গুণটি তৈরী হোক। আল্লাহ তাআলার কাছে ঐ ঈমানদারের

অনেক মর্যাদা রয়েছে, যার মধ্যে এ গুণটি বিদ্যমান আছে। কুরআনে করীমের যেখানে ঐসব লোকের আলোচনা করা হয়েছে, যাদের জন্য জান্নাত সাজানো হয়েছে, সেখানে তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ الْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ.

'যারা রাগ হজম করে নেয় এবং লোকদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেয়।' (সূরা আলে ইমরান)

এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদ হলো—

'যে ব্যক্তি নিজের রাগ দমন করবে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর থেকে তার শাস্তিও দমন করে দেবেন।'

বড় ভাগ্যবান ব্যক্তি তারাই, যারা রাগের সময় এসব আয়াত ও হাদীসের কথা স্মরণ করে তা দমন করে এবং পুরস্কার স্বরূপ যাদের থেকে আল্লাহ তাআলা তার শাস্তি দমন করে নেবেন।

কথাবার্তায় মিষ্টভাষা

ইসলামের চারিত্রিক শিক্ষাগুলোর মধ্যে এটাও একটা বিশেষ শিক্ষা যে, ব্যক্তি যখন পরস্পর আলাপ-আলোচনা করবে, তখন তার ভঙ্গি হবে আকর্ষণীয় এবং ভাষা হবে সুমিষ্ট। অশ্লীল ও শক্ত কথা পরিহার করবে। কুরআনের ঘোষণা—

وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا.

'আর লোকদের সাথে সুন্দর কথা বলো।'

ইসলাম খোশকালামীকে সওয়াব এবং শক্ত কথাকে গুনাহ বলে চিহ্নিত করেছে। হাদীস শরীফে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'কোমল ভাষায় আকর্ষণীয় আঙ্গিকে আলাপচারিতা সওয়াবের কাজ এবং এটা এক ধরনের সদকা।'

অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

'অশ্লীল ভাষা হল 'নিফাক'। (অর্থাৎ মুনাফিকের খাসলত।"

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে অশ্লীল ভাষা ও শক্ত কথার মত জালিম ও মুনাফিকসুলভ অন্যায় আচরণ থেকে হেফাজত করুন। আর সদালাপ ও মিষ্টভাষা অবলম্বন করার তাওফীক দান করুন। যা ঈমানী একটি গুণ আর আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাদের আদর্শ একটি গুণ।

বিনয় ঃ

ইসলাম মুসলমানদের মাঝে যেসব গুণাবলীকে বদ্ধমূল করে দিতে চায়, তন্মধ্যে এটাও একটি গুণ। আল্লাহর অন্য বান্দাদের তুলনায় নিজেকে অক্ষম, অপারগ ও ছোট মনে করবে। অহংকার ও দাম্ভিকতা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখবে। অধমতাকে নিজেকে অলংকার হিসেবে গ্রহণ করবে। যারা পার্থিব জীবনটা বিনয়াবনতভাবে কাটাবে, তারাই মহান আল্লাহর কাছে সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করে সৌভাগ্যবান হবে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে—

وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا.

'রহমানের বিশেষ বান্দা তো তারাই যারা পৃথিবীতে অবনত মস্তকে চলে।' (সূরা ফুরকান)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَ لَا فَسَادًا.

'পরকালের ঐ ঘরের (জান্নাত) উত্তরাধিকারী আমি তাদেরকেই করব, যারা পৃথিবীতে বড়ত্ব অর্জন করতে চায় না, আর চায় না সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে।' (সূরা কাসাস)

একটি হাদীসে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যে ব্যক্তি বিনয় অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা এত উন্নত করে দেবেন যে, তাকে 'ইল্লিয়্যীনে'র উচ্চ শিখরে পৌঁছে

দেবেন। (যা জান্নাতের সর্বোচ্চ শ্রেণী)'

পক্ষান্তরে অহংকার অহমিকা আল্লাহ তাআলার কাছে এত নিন্দনীয় যে, একটি হাদীসে প্রিয়নবী ইরশাদ করেন--

'যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ঘাড় ধরে জাহান্নামে ঠেলে দিবেন।'

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—

'যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংবোধ থাকবে, বড়ত্ব থাকবে, সে জান্নাতে যেতে পারবে না।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি ইরশাদ—

'অহংকার থেকে বাঁচ, অহংকার এমনই একটি মারাত্মক গুনাহ যা সর্বপ্রথম ইবলিসকে ধ্বংস করে দিয়েছে।'

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই শয়তানী খাসলত থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আর তার পছন্দমত বিনয়ী মনোভাব অর্জন করার তাওফীক দান করুন। যা প্রভুর সামনে গোলামের গোলামী অলংকার। এখানে আমাদেরকে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের এই বিনয়ানুভূতি শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপারেই প্রকাশ পাবে। ধর্মীয় ও মানবাধিকারের ব্যাপারে আমাদেরকে দৃঢ়তা ও শক্তিশালী মজবুত অবস্থানের পরিচয় দিতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ এটাই। মোটকথা, মুমিনের মাহাত্ম্য হল, সে ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে নরাধম ও ছোট ভাববে। কিন্তু অধিকারের বেলায় দৃঢ়পদ থাকবে। কারো ডর-ভয়ে এক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শন করবে না।

ধৈর্য ও সাহসিকতা ঃ

এ দুনিয়াতে মানুষের সামনে দুঃখ-কষ্ট এবং বিপদাপদও এসে থাকে। কখনো অসুখ-বিসুখ, কখনো অভাব-অভিযোগ, কখনো অত্যাচারী শত্রুর মুখোমুখী হতে হয়, আবার কখনো অন্য কোন আঙ্গিকে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থায় জর্জরিত হতে হয়। এসব অবস্থায় ইসলামের শিক্ষা হল, আল্লাহর বান্দারা ধৈর্য এবং সাহসিকতার সাথে প্রতিকূলতার

পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যাবে। যতই দুঃখ-কষ্ট এবং বিপদাপদ থাকুক না কেন দৃঢ়পদে এবং নির্ভীকচিত্তে স্বীয় নীতির উপর অবিচল থাকবে। এমন লোকদের জন্য আল-কুরআনের সুসংবাদ ঘোষিত হয়েছে। ইরশাদে ইলাহী—

وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ.

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ধৈর্যধারণকারীদের সাথে রয়েছেন।'

অনত্রে আল্লাহ সুবহানুহু ওয়াতাআলা বলেন—

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

'আর আল্লাহ তাআলা ধৈর্যধারণকারীদেরকে ভালবাসেন।'

অন্য এক আয়াতে এসব ঈমানদার লোকদের খুব প্রশংসা করা হয়েছে। যারা তাদের দুঃখ-কষ্টে এবং সত্যের জন্য জেহাদের ময়দানে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। আর আত্মোৎসর্গের ভয়ে পিছুটান দেয় না।

মহান রব্বুল আলামীন বলছেন—

وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِيْنَ الْبَأْسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا و اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

'আর যারা দুঃখ-কষ্ট এবং জিহাদের ময়দানে দৃঢ়পদ থাকে, তারাই সত্যবাদী, তারাই মুত্তাকী।'

একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'ধৈর্যধারণ করার যোগ্যতা লাভ করার চেয়ে উত্তম আর কোন নিয়ামত নেই।'

অন্য এক হাদীসে এসেছে—

'ধৈর্য ঈমানের অর্ধাংশ।' (জামউল ফাওয়াইদ (মরফু))

পক্ষান্তরে, অধৈর্য এবং কাপুরুষতা ইসলামের দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম ত্রুটি। যা থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ দুআতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের

সবাইকে ধৈর্য ও সাহসিকতার অলংকারে ভূষিত করুন। আর অধৈর্যতা ও কাপুরুষতা থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

ইখলাস ও নিয়তশুদ্ধি ঃ

'ইখলাস' সমূহ ইসলামী আদাব ও আখলাক এমনকি পুরো ইসলামের প্রাণ ও মধ্যমণি। ইখলাসের অর্থ হল, আমরা যে কাজই করি না কেন, তা একমাত্র আল্লাহর জন্য ও তাঁর সন্তুষ্টির নিয়তেই সম্পাদন করব। এছাড়া আমাদের আর কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকবে না। ইসলামের গোড়া হল তাওহীদ। আর তাওহীদ বা একত্ববাদের পূর্ণতা ইখলাসের মাধ্যমেই সাধিত হয়। অর্থাৎ পূর্ণ তাওহীদ হল, বান্দার প্রতিটি কাজ-কর্ম আল্লাহর জন্যই হবে। তাঁর সন্তুষ্টি এবং এর পুরস্কারপ্রাপ্তিই হবে আমাদের একমাত্র নিয়ত ও উদ্দেশ্য।

হাদীসে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

> 'যে ব্যক্তি কাউকে আল্লাহর জন্যই মহব্বত করল, আল্লাহর জন্যই শত্রুতা করল, আল্লাহর জন্যই দান করল, আল্লাহর জন্যই দান থেকে বিরত থাকল—সে তার ঈমানকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিল।'

সারকথা হল, যে ব্যক্তি তার পার্থিব সম্পর্ক এবং কাজ-কারবার স্বীয় প্রবৃত্তিতুষ্টি বা অন্য কোন হীন উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে একমাত্র রেজায়ে ইলাহী বা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করবে, সে-ই পরিপূর্ণ মুমিন মুসলমান হয়ে যাবে। অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

> 'আল্লাহ তাআলা তোমাদের আকার-আকৃতিকে দেখেন না, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর।'

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কাছে পুরস্কার ও সওয়াবের ব্যাপারটি ইখলাস এবং নিয়তশুদ্ধির উপর নির্ভর করে। অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

> 'হে লোকসকল ! তোমরা নিজের কাজ-কর্মে ইখলাস তৈরী কর।

আল্লাহ তাআলা এসব আমল বা সৎ-কর্মই কবুল করেন যাতে ইখলাস থাকে।'

পরিশেষে একটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে, যা শুনে আমাদের সবাইকে কম্পিত হওয়া উচিত। কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, যখন হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) এ হাদীসখানা শুনাতেন, কখনো তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম কিছুসংখ্যক কুরআনের আলিম, কিছুসংখ্যক শহীদ এবং কিছুসংখ্যক ধনী ব্যক্তিকে সামনে আনা হবে। তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তোমরা আমার জন্য পার্থিব জীবনে কি কি করেছ? কুরআনের আলিম বলবে ঃ আমি সারাটা জীবন তোমার মহাগ্রন্থ পাঠ করেছি, তা নিজে শিখেছি এবং অন্যকে শিখিয়েছি। আর এসব তোমার জন্য করেছি। ইরশাদ হবে ঃ তুমি মিথ্যাবাদী ! তুমি তো এসব নিজের প্রসিদ্ধি লাভের জন্য করেছ, যা দুনিয়াতে তুমি পেয়ে গিয়েছ। অতঃপর ধনী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হবে ঃ আমি তোমাকে সম্পদ দান করেছিলাম, তুমি তা থেকে আমার জন্য কি করেছ? সে বলবে ঃ সমূহ সৎকাজে এবং সৎপথে তোমার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেছি। ইরশাদ হবে ঃ তুমি মিথ্যাবাদী ! তুমি দুনিয়াতে এসব দান-খয়রাত শুধু এ জন্যই করেছ যে, তোমার দানশীলতার খুব চর্চা হবে আর লোকেরা তোমার খুব প্রশংসা করবে। দুনিয়াতে তুমি এসব পেয়ে গিয়েছ। অতঃপর শহীদকে এমনই প্রশ্ন করা হবে। সে বলবে ঃ তোমার দেয়া সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ছিল আমার প্রাণ। আমি একেও তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছি। ইরশাদ হবে ঃ তুমি মিথ্যাবাদী ! তুমি তো জিহাদে এ জন্যই অংশগ্রহণ করেছিলে যে, তোমার বাহাদুরীর কথা যেন লোকসমাজে ছড়িয়ে পড়ে, তোমার খুব নাম-ধাম হবে। তোমার প্রসিদ্ধি এবং নাম-ধাম তুমি দুনিয়াতে পেয়ে গিয়েছ। অতঃপর উক্ত তিনজনের জন্য নির্দেশ দেয়া হবে, এদেরকে উপুড় করে

করে শুইয়ে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিয়ে ফেলে দেয়া হোক।

সুতরাং তাদেরকে দোযখে ফেলে দেয়া হবে।'

ভাইয়েরা! আমাদের আমলগুলোকে এ হাদীসের আলোকে পরখ করা উচিত এবং অন্তরে আর নিয়তে ইখলাস তৈরী করার চেষ্টা করা উচিত। হে আল্লাহ! আমাদের সবাইকে ইখলাস দান কর। আমাদের ইচ্ছা ও নিয়তগুলোকে তোমার একান্ত দয়া ও অনুগ্রহে ঠিক করে দাও। আমাদেরকেও তোমার ইখলাসওয়ালা বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। আমীন।

সবক ঃ ১০

সর্বাধিক ভালবাসা আল্লাহ, রাসূল ও ধর্মের প্রতি

ভাইয়েরা ! ইসলাম যেভাবে আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এবং নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত সম্পাদনের শিক্ষা দেয়, ঈমানদারী, পরহেযগারী, সৎস্বভাব ও সদাচার অবলম্বনের পথপ্রদর্শন করে, ঠিক তেমনি ইসলামের একটি বিশেষ শিক্ষা হল, আমরা পার্থিব সবকিছু থেকে এমনকি স্বীয় পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রী, জানমাল এবং ইজ্জত-সম্মান থেকেও আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র এ ধর্মকে বেশী ভালবাসব। অর্থাৎ কখনো যদি এমন নাজুক পরিস্থিতি সামনে আসে যে, দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকতে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধান মেনে চলার স্বার্থে যদি জানমাল, ইজ্জত-সম্মানের ঝুঁকি দেখা দেয়, তখনো আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং তাঁদের মনোনীত ধর্ম—ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। আর জানমাল ও ইজ্জত-সম্মানের উপর দিয়ে রোলার চালানো হলেও চলতে দিব। তবুও দ্বীন-ধর্মকে ছাড়ব না।

কুরআন-হাদীসের জায়গায় জায়গায় বলা হয়েছে যে, যারা ইসলামের দাবীদার, অথচ আল্লাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাদের মনোনীত ধর্মের ব্যাপারে এমন ভালবাসা ও এই মানের সম্পর্ক থাকবে না, তারা প্রকৃত মুসলমানই নয় বরং তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ভীষণ শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত।

সূরা তাওবায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ

...رَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ

تَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.

'(হে নবী আপনি) বলুন! তোমাদের কাছে যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধনসম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ, তার রাসূল ও তার রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না।' (সূরা তওবা ২৪)

এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁদের মনোনীত দ্বীনের বিপরীতে নিজেদের পিতামাতা, স্ত্রী–সন্তান, ধনসম্পদের প্রতি বেশী মুহাব্বত রাখবে আর যাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং দ্বীনের খিদমত, দ্বীনের উন্নতির চিন্তা–চেতনার চাইতে এ সবের চিন্তা বেশী হবে, তারা আল্লাহর ভীষণ অবাধ্য এবং তাঁর গজবের উপযুক্ত। একটি সহীহ হাদীসে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'দ্বীন ও ঈমানের স্বাদ তাদের ভাগ্যেই জুটবে, যাদের মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকবে—

১. আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসা তার কাছে সবচাইতে বেশী হবে।

২. কোন মানুষকে যদি ভালবাসে তবে আল্লাহর জন্যই ভালবাসে। (কাউকে আল্লাহর জন্য ভালবাসা মানেই আল্লাহকে ভালবাসা।)

৩. ঈমান আনার পর কুফুরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাঁর কাছে এমন অপছন্দনীয় হবে, যেমন (তাকে) আগুনে ফেলে

দেয়াকে অপছন্দ করে।'

বুঝা গেল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রকৃত মুসলমান সে-ই, যার কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ভালবাসা সবচাইতে বেশী। এমনকি দুনিয়ার কাউকে যদি সে ভালবাসে, তবে আল্লাহর জন্যই ভালবাসে। আর দ্বীনের প্রতি তাঁর এ পরিমাণ আকর্ষণ হবে যে, তা ত্যাগ করা তার জন্য এতই কষ্টকর হবে যেমন কষ্টকর মনে হয় আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে।

অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন এবং প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে আমার ভালবাসা তার পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি এবং দুনিয়ার সব মানুষের চাইতে বেশী না হবে।'

ভাইয়েরা! ঈমান মূলতঃ তাকেই বলে, ব্যক্তি পুরোপুরি আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য নিবেদিত হয়ে যাবে। নিজের সকল সম্পর্ক এবং চাহিদাকে দ্বীনের জন্য পরিত্যাগ করতে পারে, যেভাবে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) এটা করে দেখিয়েছেন। আজও আল্লাহর প্রকৃত ও সত্যিকার বান্দাদের একই অবস্থা। যদিও তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। আমীন।

সবক ঃ ১১

দ্বীনের দাওয়াত ও খিদমত

ভাইয়েরা! যেভাবে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ঈমান আনা, তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়, তেমনি আল্লাহর যে বান্দারা এই সহজ-সরল রাস্তা থেকে বে-খবর, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে ব্যস্ত, তাদেরকে এ ইসলাম সম্পর্কে জানাতে, বুঝাতে এবং তাদেরকে এ পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করাও আমাদের জন্য ফরয। আমাদের উচিত, এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আল্লাহ তাআলার অনুগতশীল এবং পরহেজগার গোলাম বনে যাওয়া, একেই বলে দ্বীনের দাওয়াত ও দ্বীনী খিদমত।

এ কাজটি আল্লাহ তাআলার কাছে এতই দামী যে, তিনি এ কাজের জন্য অগণিত নবী-রাসূল এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আর ঐ মহান নবী-রাসূলগণ অমানবিক দুঃখ-কষ্ট, জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে দ্বীনী দাওয়াতের কাজ সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন। তবুও তাঁরা চেষ্টা করে গিয়েছেন যে, মানুষ হেদায়াতের রাস্তা পেয়ে যাক। আল্লাহর পথের পথিক হয়ে যাক। (আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ও তাদের সাথী-সঙ্গীদেরকে অসীম রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিন। আমীন।)

নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর মাধ্যমেই ঘোষণা করে দেন, দ্বীনী শিক্ষা ও দাওয়াতের গুরুদায়িত্ব পালন করে মানুষকে হিদায়াতের পথপ্রদর্শন করার জন্য এখন থেকে আর কোন নবী-রাসূলের আগমন ঘটবে না। এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনী দাওয়াতের এ মহান দায়িত্ব পালন করবে শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দ্বীনের প্রতি যারা ঈমান এনেছে এবং তা গ্রহণ করেছে।

মোটকথা, নবুওয়াত ও রিসালাতের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দ্বীনী দাওয়াত ও মানবতাকে হিদায়াতের পথপ্রদর্শনের মহান দায়িত্ব হুযূর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের হাতে সঁপে দেয়া হয়। এটা মূলতঃ এই উম্মতের মহান মর্যাদার পরিচায়ক। শুধু তাই নয়, কুরআনে কারীমে এই দাওয়াতের কাজকে এ উম্মতের মূল লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেন এ উম্মতকে সৃষ্টিই করা হয়েছে এ কাজের জন্য।

ইরশাদে রব্বানী—

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.

'(হে উম্মাতে মুহাম্মাদী!) তোমরাই তো ঐ উত্তম জামাত, যাদেরকে এ দুনিয়াতে আনা হয়েছে মানুষের শুদ্ধির জন্য, তোমরা ভাল কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ, আর তোমরা তো আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ঈমানদার।'

(সূরা আলে ইমরান)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেরা ঈমান ও সৎপথে চলা ও অন্যদেরকে ঈমান ও সৎপথের দিকে দাওয়াত ও মন্দ পথ থেকে নিষেধ করার জন্য অন্যান্য উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই দাওয়াতের কাজ এ উম্মাতের বিশেষ এক দায়িত্ব। এ জন্যই এ উম্মাতকে শ্রেষ্ঠ উম্মাত ঘোষণা করা হয়েছে। বুঝা গেল, শ্রেষ্ঠ উম্মাত হওয়ার কারণ হল—দাওয়াতের যিম্মাদারী। সুতরাং উম্মাত যদি দ্বীনের এ দাওয়াত, মানুষকে সৎপথে চালানোর চেষ্টা এবং হিদায়াতের এই ফরয কাজ ছেড়ে দেয় তাহলে আর তারা এই শ্রেষ্ঠত্বের উপযুক্ত থাকবে না। ভীষণ অপরাধী সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ তাআলা এত বড় একটা যিম্মাদারী তাদের হাতে ন্যস্ত করলেন আর তারা তা প্রত্যাখ্যান করল! এর উদাহরণ হল, কোন রাষ্ট্রপ্রধান তার সেনাবাহিনীর একটি ইউনিটকে শহরের শৃংখলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত করলেন। যেন তারা মানুষদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। কিন্তু সেনাবাহিনীর লোকেরা তাদের এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিল না। বরং তারা নিজেরাই মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়ে, এ ক্ষেত্রে আমরা সবাই বুঝি যে, এই সেনাবাহিনীর সদস্যরা পুরস্কার বা পদোন্নতি তো দূরের কথা, ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন

হবে। সাধারণ মানুষের শাস্তির তুলনায় দ্বিগুণ শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে।

আফসোস ! বর্তমান মুসলিম উম্মাহর একই অবস্থা। তারা দ্বীনের দাওয়াত দেয়া তো দূরের কথা, নিজেরাই খোদাদ্রোহীতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আজ উম্মাতের মধ্যে পাঁচ শতাংশের চেয়েও কম লোক রয়েছেন যাঁরা প্রকৃত মুমিন মুসলমান। যাঁরা সৎকাজ করে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকে। এমতাবস্থায় সর্বাগ্রে আমাদের দায়িত্ব হল, দাওয়াত ও হিদায়াতের কাজ উম্মাতের ঐ শ্রেণীর মধ্যে চালিয়ে যাওয়া, যারা দ্বীন-ঈমান, সৎকাজ ও হিদায়াতের রাস্তা থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

এর একটি কারণ হল, যেসব লোকেরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, তাদের আমলী অবস্থা যা-ই হোক, তারা ঈমান-ইসলামের স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে এক ধরনের সম্পর্ক জুড়ে ফেলেছে। ইসলামী সোসাইটির একজন সদস্য হয়ে গেছে। এজন্য তাদের আমলী উন্নতির চিন্তা অবশ্যই সর্বাগ্রে করতে হবে। যেমন সাধারণভাবেই ব্যক্তির দেখাশুনার দায়িত্ব প্রথমে তার নিজের সন্তানদের প্রতি, অতঃপর নিকটাত্মীয়দের প্রতি তারপর অন্যান্যের প্রতি।

আরেকটি কারণ হল, দুনিয়ার সাধারণ মানুষ মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা দেখে ইসলামের অলৌকিক সৌন্দর্য অনুধাবন করতে পারবে না। বরং উল্টো তাদের দেখে তো আজকাল সবাই ঘৃণায় নাক সিঁটকায়। কোন ধর্মের ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করা হয় সে ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিবর্গের ধর্মানুসরণের অবস্থা দেখে। তাদের আখলাক-চরিত্র, তাদের আচার-অনুষ্ঠান যত উন্নত এবং যত যৌক্তিক হবে, তাদের ধর্মই সার্বজনীন হয়ে উঠবে। পৃথিবীর সাধারণ মানুষের এ রীতি সবসময়ই ছিল। এখনো আছে। যে যুগ পর্যন্ত মুসলমানগণ সাধারণ ভাবেই প্রকৃত মুসলমান ছিলেন। পুরোপুরি ইসলামী বিধি-নিষেধ মেনে চলতেন। দুনিয়াবাসী তাঁদেরকে দেখে-দেখেই ইসলামে আকৃষ্ট হয়ে যেত। এলাকা-কে-এলাকা, গোষ্ঠী-কে-গোষ্ঠী দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু যখন থেকে মুসলমানদের মধ্যে আমলী অধঃপতন শুরু হয়ে যায়, সাংস্কৃতিক নষ্টামী তাদের মাঝে বাসা বাঁধতে

থাকে, নামসর্বস্ব মুসলমানে পরিণত হয়ে যায়. অন্তর খালি হয়ে যায় ঈমান ও তাকওয়ার আলো থেকে—তখন থেকেই দুনিয়া ইসলাম সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করতে থাকে।

মোটকথা, আমাদেরকে এ সূক্ষ্ম বিষয়টি বুঝে নিতে হবে যে, উম্মাতে মুসলিমার জীবনযাপন রীতি ও তাদের সামগ্রিক ক্রিয়াকাণ্ড ইসলামের পক্ষে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সার্টিফিকেট। তা যদি ভাল হয়, তবে দুনিয়া ইসলাম সম্পর্কে ভাল ধারণা এবং ভাল মতামত উপস্থাপন করবে। আর এমনি এমনি মানুষ ইসলামের দিকে ঝুকে পড়বে। আর যদি উম্মাতের ক্রিয়াকাণ্ড ইসলাম বহির্ভূত এবং মন্দ হয়ে যায়, তবে দুনিয়া ইসলামকেই মন্দ ভাবতে থাকবে। এমতাবস্থায় তাদেরকে যদিও ইসলামের দাওয়াত দেয়া যায়, তবুও এতে কোন ফায়দা হবে না। অতএব, মুসলমানগণের নিজেরা নিজেদের দ্বীন মেনে চলা, তার বিধি-বিধানুযায়ী জীবন পরিচালনা করার উপরই অন্যাদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত কার্যকরী হওয়ার পূর্বশর্ত। এ হিসেবে সর্বপ্রথম মুসলমানদেরকেই ইসলামে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। মুসলিম সমাজে দ্বীনী জীবন-যাপনকে সাধারণ রেওয়াজ দিতে হবে এবং এর জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে।

কুরআনে কারীমে এ কাজকে অর্থাৎ দাওয়াত ও খিদমতের কাজকে জিহাদ বলেও অভিহিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয় 'জিহাদে কবীর' অর্থাৎ বড় জিহাদ বলা হয়েছে। সূরা ফুরকানের আয়াত—

وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

এ আয়াতের ব্যাপারে মুফাসসিরীনদের সাধারণ মতামত হল, এখানে 'দাওয়াত ও তাবলীগ' বুঝানো হয়েছে।

আর এতে কোন সন্দেহ নেই, যদি এই দাওয়াতের কাজ ইখলাস ও উত্তম নিয়তে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, তবে নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর কাছে তা বড় জিহাদ বলে বিবেচিত হবে।

অনেকে মনে করেন, শুধু দ্বীনী মূলনীতির ভিত্তিতে দুশমনের বিরুদ্ধে

লড়াই করাই 'জিহাদ'। কিন্তু তাত্ত্বিক কথা হল, এখন এই দ্বিমুখী ফেতনার যুগে দ্বীনের দাওয়াত ও আল্লাহর বান্দাদেরকে হিদায়াত ও আত্মশুদ্ধির চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালান বিশেষ একটি 'জিহাদ'।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের পরও প্রায় বার-তের বছর মক্কা-মুকাররমায় অবস্থান করেন এই পুরো সময় জুড়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহাদ ছিল এই—'দাওয়াত'। বিরোধিতা ও বিভিন্ন ধরনের উৎপীড়ন-নিপীড়ন সহ্য করে নিজেরা দৃঢ়পদে দ্বীনের উপর অবিচল থাকেন। সাথে সাথে অন্যদেরকে হিদায়াতের পথে আনার সচেষ্ট দাওয়াত অব্যাহত রাখেন।

মোটকথা, পথভোলা বান্দাদেরকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয়া এবং সঠিক পথের দিশা দেয়ার প্রচেষ্টা। এক্ষেত্রে সময় ও আয়েশ-শ্রান্তি উৎসর্গ করা এবং এ পথে সম্পদ ব্যয় করা—সবই মহান আল্লাহর কাছে জিহাদ হিসেবেই পরিগণিত। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে এটাই মোক্ষম 'জিহাদ'।

এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনকারীদের জন্য যে পুরস্কার আর এ কাজ ত্যাগকারীদের জন্য যে অভিশাপ ও ভয়াবহ অবস্থা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে, নিম্নে বর্ণিত হাদীস থেকে তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যে ব্যক্তি লোকদেরকে হিদায়াতের দাওয়াত দেয় এবং সৎপথের দিকে ডাকে, তার ডাকে সাড়া দিয়ে লোকেরা যত ভাল কাজ ও নেকী করবে এর প্রতিদানে তারা যত সওয়াব পাবে, ঠিক সে পরিমাণ সওয়াবই দাওয়াতদাতা বা দাঈ পাবে। অথচ নেক কাজ সম্পাদনকারীদের থেকে সওয়াবের পরিমাণ কমানো হবে না।'

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, দাওয়াত প্রদানকারীর দাওয়াতের ফলে দশ-বিশজন ব্যক্তি সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে সৎকাজ সম্পাদন করতে থাকে, আল্লাহ-রাসূলকে চিনতে থাকে, নামায পড়তে থাকে, আরো অন্য ফরয কাজ সম্পাদন করতে থাকে, গুনাহ ও মন্দকাজ থেকে বাঁচতে থাকে, তবে এ সবের বদৌলতে তারা নিজেরা যে পরিমাণ

সওয়াব লাভ করবে, সকলের সওয়াবের **সমষ্টি** পরিমাণ সওয়াব দাওয়াতদাতা বা দাঈ একাই লাভ করবে। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এত বেশী পরিমাণে সওয়াব কামাই করার এছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। কী লাভজনক কাজ! একাই হাজার হাজার মানুষের ইবাদত ও সৎকাজের সওয়াব লাভে ধন্য হবে।

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন—

'হে আলী! আল্লাহর কসম, তোমার মাধ্যমে যদি এক ব্যক্তিও হিদায়াত পেয়ে যায়, তবে তা তোমার পক্ষে অসংখ্য লাল উট পাওয়ার চেয়েও উত্তম।' (আরববাসীরা লাল উটকে অনেক বড় সম্পদ বলে গণ্য করত।)

আল্লাহর বান্দাদেরকে হিদায়াত ও সৎপথের দিকে দাওয়াত দেয়া অনেক মূল্যবান খিদমত ও উচুমানের সৎকাজ। আম্বিয়া (আঃ)-এর বিশেষ উত্তরাধিকার ও প্রতিনিধিত্ব। দুনিয়ার যে কোন মূল্যবান সম্পদের সাথে এর কোন তুলনাই চলে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে দাওয়াতের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে সহজবোধ্য একটি উদাহরণ উপস্থাপন করেন, যার সারাংশ হল—

'মনে কর একটি জাহাজ চলছে। যা দুইতলা বিশিষ্ট। নিচতলার যাত্রীদের প্রয়োজনীয় পানি উপর তলায় গিয়ে আনতে হয়। এতে উপর তলার যাত্রীদের অনেক কষ্ট হয়। এতে তারা নারাজ। এমতাবস্থায় নিচতলার যাত্রীরা সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা উপর তলা থেকে পানি আনতে না গিয়ে নিজেরাই নিচতলায় পানির ব্যবস্থা করে নিবে। নিচতলায় তারা জাহাজের নিচে দিয়ে একটি ছিদ্র করে নিবে, ব্যাস সেখান দিয়ে পানি উঠবে এবং সে পানি দিয়ে তারা তাদের প্রয়োজন মেটাবে। তাদের এ সিদ্ধান্তে যদি উপর তলার যাত্রীরা বাধা না দেয়, তবে ফলাফল ভীষণ ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে। নিচতলা ও উপর তলার সব যাত্রীদের নিয়েই জাহাজটি পানির গভীরে তলিয়ে যাবে আর যদি উপর তলার যাত্রীরা তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদের উক্ত ধ্বংসাত্মক

সিদ্ধান্ত থেকে বিরত রাখতে পারে, তবে তো তাদেরকে বাঁচিয়ে দিবে এবং নিজেরাও বেঁচে যাবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ঠিক তেমনি অসৎকাজ ও গুনাহের অবস্থা। দুনিয়ার সৎকর্মশীল বুদ্ধিমান দাঈরা যদি গুনাহগার লোকদেরকে হিদায়াতের পথে দাওয়াত দিয়ে তাদেরকে গুনাহ থেকে বিরত না রাখে, তবে তাঁর ফলাফলও এমন ভীষণ ভয়াবহ হবে। গুনাহগারদের গুনাহের ফলে আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হবে। আর সবাই সৎ-অসৎ নির্বিশেষে আল্লাহর শাস্তি ভোগ করবে। আর যদি তাদেরকে তাদের অসৎকাজ ও গুনাহ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হয়, তবে সবাই শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে।'

অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ গুরুত্বের সাথে কসম খেয়ে ইরশাদ করেন—

'ঐ আল্লাহর কসম! যার আয়ত্বাধীন আমার জানপ্রাণ। তোমরা ভাল কথা ও সৎকাজের জন্য লোকদেরকে বলতে থাক। অসৎ কাজ থেকে বিরত করতে থাক। মনে রেখ : তোমরা যদি তা না কর, সম্ভাবনা আছে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর কোন ভীষণ শাস্তি চাপিয়ে দেবেন। আর তোমরা তখন দুআর উপর দুআ করতে থাকবে। কিন্তু তা কবুল করা হবে না।'

ভাইয়েরা! বর্তমান কালের কিছু বিজ্ঞ উলামা-মাশায়েখের মতামত হল, এখন মুসলমানদের উপর বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ আসছে, তাদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চলছে, আর দুনিয়াব্যাপী উলামায়ে কিরামের হাজারো দুআ-দরূদ, খতম-ওযীফা সত্ত্বেও সেসব বিপদাপদ থেকে উদ্ধার সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। এর মূল কারণ হল, আমরা দাওয়াত ও খিদমতের কাজ থেকে দূরে সরে গিয়েছি, যার জন্য আমাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে। নবুওয়াত খতম হয়ে যাওয়ার পর যার পুরো দায়িত্ব আমাদের হাতে অর্পিত হয়েছে। দুনিয়াতেও তো নিয়ম এটাই, যে সেনা সদস্য তার বিশেষ ডিউটি যথাযথ পালন না করে, তাকে চাকুরী থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হয় এবং রাষ্ট্রপ্রধান তার জন্য উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

শাস্তিরও ব্যবস্থা করেন।

আসুন! আমরা এ ফরয দায়িত্ব ও ডিউটিকে যথাযথভাবে পালন করার নতুন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হই। আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে সাহায্য করবেন।

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ

'যারা আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করবে, আল্লাহ তাআলা অতি অবশ্যই তার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন।'

সবক ঃ ১২

ধর্মে অবিচলতা

ঈমান আনার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি যে বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত হয়, তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এটাও যে, বান্দা পরিপূর্ণ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে ধর্মে অবিচল থাকবে। চাই পরিবেশ পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল থাকুক। ধর্মের লাগাম কোন অবস্থাতেই সে হাতছাড়া করতে প্রস্তুত থাকবে না। এরই নাম হলো—ধর্মে অবিচলতা বা 'ইস্তিকামাত'। কুরআনে এ ধরনের সৌভাগ্যবান লোকদের জন্য অনেক পুরস্কার এবং মর্যাদা বৃদ্ধির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এক জায়গায় ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَ أَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ نَحْنُ أَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ.

'যারা স্বীকার করে নিয়েছে (এবং অন্তরে বিশ্বাস করেছে) যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের রব (আর আমরা তার মুসলমান বান্দা) অতঃপর তারা এ কথার উপর দৃঢ়পদ থাকে (অর্থাৎ এই স্বীকারোক্তির হক ঠিকভাবে আদায় করতে থাকে এবং এথেকে কখনো পিছপা হয় না) তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতারা এ পয়গাম নিয়ে অবতীর্ণ হবেন যে, তোমরা শঙ্কিত হয়ো না, কোন ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করো না এবং ঐ বেহেশতের সুসংবাদ নাও, যার ব্যাপারে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে আমি তোমাদের সাথে থাকবো, আর ঐ বেহেশতে তোমাদের জন্য যা মন চায়, তা-ই প্রস্তুত থাকবে। তোমরা যা চাইবে, তা-ই সেখানে পাবে। এমন

সম্মানজনক আতিথেয়তা তোমাদের ক্ষমাশীল ও করুণাময় প্রভুর পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা হবে।' (হা-মীম সিজ্‌দা)

সুবহানাল্লাহ! দ্বীনের উপর দৃঢ়পদ ও অবিচল বান্দাদের এবং গোলামীর হক আদায়কারীদের জন্য এ আয়াতে কি আকর্ষণীয় সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে!

ঐ ব্যক্তি বাস্তবিকই বড় ভাগ্যবান ঃ

একটি হাদীসে এসেছে—

'একজন সাহাবী (রাযিঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলেন, হযরত! আমাকে পরিপূর্ণ এমন এক উপদেশ প্রদান করুন, যেন আপনার পর আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে ইরশাদ করেন ঃ শুধু আল্লাহকে রব বলে মেনে নাও আর এর উপর দৃঢ়পদ থাক। (আর সেভাবেই অনুগত গোলামসুলভ জীবনযাপন কর।)'

কুরআনে করীমে আমাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা তার কতক একান্ত অনুগত বান্দাদের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। যারা ভীষণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ধর্মে অবিচল ছিলেন। আকর্ষক প্রলোভন এবং কঠিন দুঃখ-কষ্টের ভয়ও তাদেরকে দ্বীন থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করতে পারেনি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হলো, মূসা (আঃ)-এর যুগের যাদুকরদের, যাদেরকে ফেরাউন মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে যাদু প্রদর্শনের জন্য একত্রিত করেছিল। বিনিময়স্বরূপ আকর্ষণীয় বড় বড় পুরস্কার ও ঈর্ষণীয় মর্যাদার ওয়াদা দিয়েছিল। কিন্তু যখন যাদু ও মুজিযার প্রতিযোগিতা শুরু হলো, মূসা (আঃ)-এর মুজিযার সামনে যাবতীয় যাদুর আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন হাওয়ায় মিশে গেল এবং যাদুকরদের সামনে মূসা (আঃ)-এর ধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হলো, তখন ফেরাউনের আকর্ষণীয় পুরস্কার ও ঈর্ষণীয় মর্যাদার লোভ এবং ফেরাউনের কঠিন শাস্তির ভয় মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনার পথে তাদের সামনে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। তারা নির্দ্বিধায়

ভরপুর সমাবেশে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করলো—

اٰمَنَّا بِرَبِّ مُوْسٰى وَ هَارُوْنَ.

'মূসা ও হারুণ (আঃ) যে মহান প্রতিপালকের দাসত্বের দাওয়াত দিচ্ছেন, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম।'

অবস্থা দেখে ফেরাউন তাদেরকে ভয় দেখালো, তোমাদের হাত–পা কেটে শূলিতে চড়িয়ে দেব। একথা শুনে নব ঈমানে বলিয়ান যাদুকরেরা পূর্ণ ঈমানী সাহসিকতার সাথে জবাব দিল—

فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ ۖ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۚ اِنَّا اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلَنَا خَطٰيٰنَا.

'তোমার যা নির্দেশ দেয়ার আছে তা দিয়ে দাও, তুমি তো তোমার নির্দেশাবলী কিছুদিনের এ নশ্বর দুনিয়াতেই বাস্তবায়ন করতে পারবে, আমরা তো আমাদের সত্যপ্রভুর প্রতি ঈমান এজন্য এনেছি যে, তিনি (পরকালের অনন্ত জীবনে) আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।' (সূরা ত্ব–হা)

এর চাইতেও আরও শিক্ষণীয় বিষয় স্বয়ং ফেরাউনের মহিয়ষী স্ত্রী হযরত আসিয়ার নির্যাতিত জীবন। ফেরাউন মিসর সাম্রাজ্যের স্বঘোষিত সার্বভৌম ক্ষমতাধর অধিপতি ছিল। আর তার এ স্ত্রী মিসরের সম্রাজ্ঞী হওয়ার সাথে সাথে ফেরাউনের হৃদয়েরও সম্রাজ্ঞী ছিলেন। এ থেকেই বুঝা যায় যে, পার্থিব কত সম্মান আর কী পরিমাণ বিলাসবহুল জীবন তাঁর ছিল। কিন্তু যখন তিনি হযরত মূসা (আঃ)–এর ধর্মের দাওয়াত পেলেন, এর সত্যতা তার সামনে দিবালোকের মতো ফুটে ওঠলো, তখন তিনি ফেরাউনের জুলুম–নির্যাতনের কোনই পরোয়া করলেন না, একটুও ভাবলেন না যে, পার্থিব এই শাহী মহলের আরাম–আয়েশের পরিবর্তে কতই না নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করতে হবে! মোটকথা, এসব কিছু থেকে একেবারে বেপরোয়া হয়ে তিনি তাঁর ঈমানের ঘোষণা দিয়ে দিলেন। অতঃপর এই হযরত আসিয়া সত্যধর্মে অবিচল থাকতে গিয়ে যেসব নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করেছেন, তা সত্যই ইতিহাসের এক

লোমহর্ষক ঘটনা।

ফলে মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন মর্যাদা তিনি লাভ করেন যে, কুরআনে করীমে তা অত্যন্ত সম্মানের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানদের জন্য তার ধৈর্য ও আত্মত্যাগকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইরশাদে ইলাহী—

وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهٖ وَ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

'আর আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের জন্য উপমা উপস্থাপন করেন, ফেরাউনের স্ত্রী(আসিয়া)র। যখন সে প্রার্থনা করলো, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! তুমি আমার জন্য তোমার কাছে জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দাও আর আমাকে ফেরাউনের অনিষ্টতা থেকে এবং তার অসৎ কর্মের অনিষ্টতা থেকে মুক্তি দাও এবং এই জালিম গোষ্ঠী থেকে আমাকে পরিত্রাণ দান কর।'

(সূরা তাহ্রীম)

সুবহানাল্লাহ! কেমন সম্মান! কেমন মর্যাদা! গোটা উম্মতের জন্য অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর এ প্রিয় বান্দীর ঈমানের দৃঢ়তা আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

হাদীস শরীফে এসেছে—

'মক্কা-মুকাররমায় মুশরিকরা যখন মুসলমানদের উপর জুলুম নির্যাতনের ষ্টিমরোলার চালিয়ে দিল, আর তা সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগলো, তখন কিছুসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলো ঃ হুযূর! এখন তো এসব জালেমদের অত্যাচার নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, আপনি মহান আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ

করুন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, তোমরা এখনই ঘাবড়ে গেলে? অথচ তোমাদের পূর্বসূরী ঈমানদারদের সাথে এর চাইতেও ভীষণ নির্যাতনমূলক আচরণ করা হয়েছে। এমনকি লোহার ধারালো চিরুনী তাদের মাথায় একদিকে ঢুকিয়ে অন্যদিকে বের করে দেয়া হতো, মাথায় করাত চালিয়ে একেবারে দু' টুকরো করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু এমন হিংস্র জুলুম-নির্যাতনও তাঁদেরকে তাঁদের ঈমান থেকে এতটুকুন বিচ্যুত করতে পারেনি, তারপরও তাঁরা তাদের ধর্মে অবিচল থাকতেন।' (আবু দাউদ শরীফ)

আল্লাহ তাআলা আমাদের মতো দুর্বলদেরকেও তাঁর এসব প্রকৃত গোলামদের সাহসিকতা এবং অবিচলতার কিছু অংশ হলেও দান করুন। যদি কখনো এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তবে এসব অনুগত বান্দাদের পদাংক অনুসরণ করে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সবক ঃ ১৩

দ্বীনের উপর পরিপূর্ণ আমল ও দ্বীনী খেদমত

ঈমানদারদের প্রতি মহান আল্লাহ তাআলার বিশেষ চাহিদা এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হলো, সত্য দ্বীনকে এবং আল্লাহর বাতানো সহজ-সরল পথকে যারা সত্য ও উত্তম জেনে গ্রহণ করেছে, তারা এটাকে সদা সর্বদা উজ্জীবিত রাখার জন্য এবং প্রচার-প্রসার ঘটানোর জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা চালাবে। ধর্মীয় পরিভাষায় একে 'জিহাদ' বলে। ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়ে থাকে।

যেমন, অবস্থা যদি এমন হয় যে, স্বয়ং নিজের, নিজের পরিবারের, নিজের গোষ্ঠীর এবং দলের দ্বীন হুমকির সম্মুখীন হয়, দ্বীনের উপর জমে থাকাটা মুশকিল হয়ে পড়ে, আর আল্লাহ না করুন, এর জন্য নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করতে হয়, এমতাবস্থায় স্বয়ং নিজে, পরিবারবর্গ, বংশধরদের পক্ষে দ্বীনের উপর অটল অবিচল থাকা অনেক বড় জিহাদ। তেমনি যদি কখনো মুসলমান জাতি মূর্খতা ও উদাসীনতার কারণে দ্বীন থেকে দূরে সরে পড়ে, তবে তাদের সংশোধন এবং ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা চালানো এবং এর জন্য জানমাল ব্যয় করাও এক ধরনের জিহাদ।

তেমনি আল্লাহর যেসব বান্দারা সত্য দ্বীন থেকে এবং তার নাযিলকৃত বিধি-বিধানের ব্যাপারে বিলকুল উদাসীন, তাদেরকে বুদ্ধিমত্তা ও সহানুভূতিচিত্তে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো, আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণ করা এবং এজন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো ও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

আর যদি কখনো এমন পরিস্থিতি দেখা দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ঈমানদার জামাতের হাতে সামগ্রিক শক্তি-সামর্থ থাকে, আর আল্লাহর দ্বীনের হেফাযত ও খেদমতের উদ্দেশ্যগত চাহিদাই হদে দাঁড়ায়, এর জন্য সামগ্রিক শক্তি ব্যবহার করা, তখন আল্লাহর সুনির্ধারিত বিধি-বিধান মোতাবেক দ্বীনের হেফাযত এবং খেদমতের জন্য শক্তি ব্যবহার করা 'জিহাদ', কিন্তু এটা

জিহাদ ও ইবাদত হিসেবে পরিগণিত হওয়ার জন্য দুটো বিশেষ শর্ত রয়েছে—

এক. জিহাদের পদক্ষেপ কোন ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বার্থে বা ব্যক্তিগত ও জাতিগত শত্রুতার কারণে নেয়া যাবে না। মূল উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর নির্দেশ মান্য করা এবং তাঁর দ্বীনের খেদমত করা।

দুই. জিহাদের পূর্ণ বিধি-বিধানের প্রতি দৃষ্টি রেখেই তা সম্পাদন করতে হবে।

এ দুটো শর্ত ছাড়া যদি শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তবে ইসলামের দৃষ্টিতে এটা জিহাদ নয় বরং তা সন্ত্রাসে পরিণত হবে। তেমনি অত্যাচারী রাষ্ট্রনায়কদের সামনে (চাই সে মুসলমান হোক বা অমুসলিম হোক) সত্য কথা বলাও একটি জিহাদ। যাকে হাদীস শরীফে 'উত্তম জিহাদ' ঘোষণা করা হয়েছে।

দ্বীনের উপর আমল, এর রক্ষণাবেক্ষণ ও খেদমতের এসব প্রকার প্রকরণ সবই নিজ নিজ অবস্থা সাপেক্ষে ইসলামের অবশ্য পালনীয় কাজ। আলোচ্য অবস্থা হিসেবে প্রতিটিই একেকটি জিহাদ। জিহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত ও হাদীস এখানে সন্নিবেশিত হলো। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَاجْتَبَاكُمْ.

'আর তারা আল্লাহর রাস্তায় পরিশ্রম করে, পরিশ্রম করার মতো। তিনি (তাঁর দ্বীনের জন্য) তোমাদেরকে নির্বাচন করেছেন।'

(সূরা হজ্জ)

অন্যত্র ইরশাদ করেন—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ. تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ

مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

'হে ঈমানদারেরা! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসার কথা বলবো, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়ে দিবে? তা হলো, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা, তাঁর পথে (অর্থাৎ তাঁর দ্বীনের জন্য) জানমাল দিয়ে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করো, এটা খুবই লাভজনক ব্যবসা, যদি তোমরা বুঝতে পার। (যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান নিয়ে আস, তবে তাঁর পথে জানমাল দিয়ে পরিশ্রম করো) তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন আর (পরকালে) ঐসব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হবে। আর অবিনশ্বর জান্নাতের দামীদামী বাড়ীতে তোমাদের বাসস্থান করে দেবেন। এটা তোমাদের বড় সফলতা ও কামিয়াবী।' (সূরা সফ)

হাদীস শরীফে এসেছে, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন—

'আল্লাহ তাআলার প্রতি প্রকৃত ঈমান স্থাপন এবং দ্বীনের ওপর আমল করা সবচেয়ে উত্তম।'

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেন—

'আল্লাহর যে বান্দার আল্লাহর পথে চলার দরুন তার পা ধুলোয় ধূসরিত হয়, দোযখের আগুন তার পাকে স্পর্শ করতে পারবে না।'

অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির আল্লাহর পথে (অর্থাৎ দ্বীনের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও খেদমতে) দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং তাতে অংশগ্রহণ করা নিজের ঘরের কোণে সত্তর বছর নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।'

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দ্বীনী খেদমতের এ বিরাট পুরস্কার ও সওয়াব লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সবক ঃ ১৪

শহীদের মর্যাদা ও পুরস্কার

সত্য দ্বীনের উপর অর্থাৎ ইসলামের উপর দৃঢ় অবিচল থাকার কারণে যদি আল্লাহ তাআলার কোন বান্দাকে মেরে ফেলা হয় বা দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম দিতে গিয়ে কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়, শরীয়তের পরিভাষায় তাকে 'শহীদ' বলা হয়। মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে এমন লোকদের অনেক বড় মর্যাদা রয়েছে। এঁদের ব্যাপারে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে যে, এসব লোকদেরকে কখনো মৃত মনে করো না। শহীদ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদেরকে বিশেষ এক জীবন দান করা হয়। আর তাদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের নিয়ামতরাজির বারিবর্ষণ হতে থাকে। ইরশাদে ইলাহী—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ.

'যারা আল্লাহর রাহে (অর্থাৎ তাঁর দ্বীনের পথে) নিহত হয়, তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের নিয়ামতরাজি দেয়া হয়।'

শহীদদের প্রতি আল্লাহ তাআলার কি ধরনের ভালোবাসা প্রকাশ পাবে, কি কি পুরস্কার তারা পাবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস দ্বারা তার কিছুটা ধারণা লাভ করা যাবে ;

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'জান্নাতবাসীদের কেউই এটা চাইবে না যে, তাকে আবার দুনিয়াতে প্রেরণ করা হোক। যদিও তাদেরকে বলা হয় যে, তোমাদেরকে পুরো দুনিয়া দিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু 'শহীদ' এ কামনা করবে যে, একবার নয়, পরপর দশবার তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠানো হোক, যেন প্রতিবার সে আল্লাহর পথে শহীদ

হয়ে আসবে। তাদের এ কামনা শহীদ হওয়ার বিনিময়ে প্রাপ্ত মর্যাদা ও বিশেষ বিশেষ পুরস্কার দেখেই অন্তরে জাগ্রত হবে।'

শহীদ হওয়ার কামনা ও এর প্রতি আকর্ষণের ব্যাপারে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা এমন ছিল যে, একটি হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন—

'ঐ মহান সত্তার কসম যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, আমার মন চায় যে, আমি আল্লাহর রাহে শহীদ হয়ে যাই, আবার আমাকে জীবিত করা হবে, আবার শহীদ হয়ে যাবো, আবার আমাকে জীবিত করা হবে, আবার শহীদ হয়ে যাবো, আবার আমাকে জীবন দান করা হবে, আবার আমি শহীদ হয়ে যাবো।'

অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

"শহীদ' আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ছয়টি পুরস্কার লাভ করবে— ১. তাকে শহীদ হওয়ার সাথে সাথে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং জান্নাতে তার জন্য রক্ষিত বালাখানা তাকে দেখিয়ে দেয়া হবে।

২. কবরের শাস্তি থেকে তাকে পরিত্রাণ দেয়া হবে।

৩. হাশরের বিভীষিকাময় দিনে কঠিন দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে তাকে মুক্ত রাখা হবে। যে পেরেশানীর দরুন সেখানে সবাই চেতনাহীন হয়ে পড়বে। (তারা ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ পাক মুক্তি দিবেন।)

৪. কিয়ামতের ময়দানে তার মাথায় সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক স্বরূপ এমন একটি তাজ পরিয়ে দেয়া হবে, যাতে খচিত থাকবে এমন মূল্যবান ইয়াকুত পাথর, যার মূল্য দুনিয়া ও দুনিয়ার সমূহ সম্পদের চেয়েও বেশি হবে।

৫. জান্নাতী পবিত্র হুরদের থেকে বাহাত্তর জন হুরকে তার সাথে বিবাহ দেয়া হবে।

৬. তার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য থেকে সত্তরজন লোকের মুক্তির ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।'

অন্য এক হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'শহীদের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। তবে যদি সে কারো কাছে ঋণী থাকে, তার বোঝা তার কাঁধে বাকী থেকে যাবে।'

এখানে স্মরণীয় যে, মর্যাদা ও পুরস্কার শুধু শহীদ হওয়ার উপরই নির্ভরশীল নয়। বরং দ্বীনের জন্য কোন ঈমানদার যদি নির্যাতন সহ্য করে, তাকে অপমান করা হয়, তাকে মারধর করা হয়, তার ধনসম্পদ লুটে নেয়া হয় বা অন্য কোনভাবে তার ক্ষতিসাধন করা হয়, তবে এ সবের বিনিময়েও সে মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে পুরস্কৃত হবে। আল্লাহ তাআলা এদেরকে এতো উচ্চ মর্যাদা দান করবেন যে, বড় বড় ইবাদতগুযার ও দুনিয়াবিমুখ আল্লাহওয়ালারা পর্যন্ত তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবেন। যেমন, দুনিয়াবী সাম্রাজ্যসমূহে ঐসব সিপাহীদের ভীষণ সম্মানে ভূষিত করা হয় আর তাদেরকে বড় ধরনের পুরস্কার ও উপাধি দেয়া হয়, যারা তাদের সাম্রাজ্য রক্ষা করতে গিয়ে আহত হয়, মারধর খায়, শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়, তারপরও তারা জীবনবাজি রেখে দেশরক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করে। ঠিক তেমনি মহান আল্লাহ তাআলার দরবারেও ঐসব বান্দাদের বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের উপর চলতে এবং দৃঢ়পদ থাকার 'অপরাধে' বা দ্বীনী উন্নতি সাধন করতে গিয়ে মারধর খায়, অপমান সহ্য করে বা অন্য কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়, কিয়ামতের দিন এ ধরনের লোকদেরকে যখন বিশেষ পুরস্কার বিতরণ করা হবে আর আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করবেন, তখন অন্য লোকেরা আফসোস করতে থাকবে, হায়! যদি দুনিয়াতে আমাদের সাথেও এমন করা হতো, দ্বীনের জন্য আমরাও যদি অপমানিত হতাম, মারধর খেতাম, আমাদের শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করা হতো, তাহলে তো আজ আমরাও এসব মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হতাম।

হে আল্লাহ! যদি আমাদের জন্য কখনো এমন পরীক্ষা তকদীরে থাকে, তবে আমাদেরকে আমাদের ধর্মে অবিচল রেখো, তোমার রহমত ও সাহায্য থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না। আমীন।

সবক ঃ ১৫

মৃত্যুর পরের জীবন কবর, কিয়ামত ও আখেরাত

এ বিষয়টির ব্যাপারে সবাই একমত, এ দুনিয়াতে যে-ই জন্মগ্রহণ করবে, সে একদিন–না–একদিন অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু নিজে থেকে কেউই এটা জানেনা যে, মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির কী ঘটে। এটা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। আর তাঁর মাধ্যমে নবী–রাসূলগণও জানতে পারেন। আর তাঁরা আমাদেরকে জানানোর ফলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরাও অবগত হয়ে যাই। আল্লাহ তাআলার প্রত্যেক নবী–রাসূল (আঃ) যার যার যুগে তাদের উম্মতকে খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে কোন্ কোন্ মনযিল পাড়ি দিতে হবে? দুনিয়ার কৃতকর্মের প্রতিফল প্রত্যেক মনযিলে কিভাবে পাবে? সাইয়িদুনা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সর্বশেষ নবী এবং রাসূল, তারপর আর কোন নবী কিয়ামত পর্যন্ত আসবেন না, এজন্য তিনি মৃত্যুপরবর্তী মনযিলসমূহের বর্ণনা খুব বিস্তারিতভাবে খুলে খুলে করেছেন। যদি সেসব বর্ণনাকে একত্রিত করা হয় তবে তা বৃহৎ কলেবর সমৃদ্ধ গ্রন্থের রূপ নিবে। কুরআন শরীফ ও হাদীসসমূহে এ সম্পর্কিত যা কিছু বলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্তসার এখানে সন্নিবেশিত হলো।

মৃত্যুর পর তিনটি মনযিল পাড়ি দিতে হবে। প্রথম মনযিল মৃত্যুর সময় থেকে কিয়ামত আসা পর্যন্ত, এটাকে 'আলমে বরযখ' বলা হয়। মৃত্যুর পর মানুষের মরদেহ চাই তা মাটিতে দাফন করে দেয়া হোক, চাই তা জ্বালিয়ে ছাই বানিয়ে ফেলা হোক, চাই তা সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হোক, কোন অবস্থাতেই তার আত্মা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। শুধু এটুকু হয় যে, সে আমাদের এ দুনিয়া থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এক ভিন্ন জগতে পাড়ি জমায়। সেখানে আল্লাহর ফেরেশতাগণ তার দ্বীন–ধর্ম সম্পর্কে তাকে কিছু প্রশ্ন করবেন। সে যদি সত্যিকার ঈমানদার হয়, তবে ঠিক

ঠিক জবাব দিয়ে দিবে। ফলে ফেরেশতাগণ তাকে সুসংবাদ প্রদান করবেন যে, তুমি কিয়ামত পর্যন্ত সুখ-শান্তিতে থাকো। আর সে যদি মুমিন না হয়, কাফের হয় বা শুধু নামের মুসলমান বাস্তবে মুনাফেক হয়, তবে তাকে তখন থেকেই ভীষণ শাস্তি পাকড়াও করবে, যা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। এটাই বরযখের মনযিল। এর সময়সীমা হলো, মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত।

অতঃপর দ্বিতীয় মনযিল হলো—কিয়ামত বা হাশর। কিয়ামতের অর্থ হলো, সামনে একসময় আসবে, আল্লাহর নির্দেশে পুরো সৃষ্টিজগত একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। (অর্থাৎ যেমন ভীষণ ভূমিকম্পের ফলে এলাকা-কে-এলাকা এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়, ঠিক তেমনি তখন সৃষ্টিজগত একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।) অতঃপর এক লম্বা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা যখন চাইবেন, সব মানুষকে আবার জীবিত করবেন। তখন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দুনিয়াতে আগত সব মানুষ পুনর্জীবিত হবে। আর তাদের পার্থিব কৃতকর্মের হিসাব-কিতাব নেয়া হবে। এই হিসাব-নিকাশে আল্লাহ তাআলার যেসব সৌভাগ্যবান বান্দা মুক্তি পাবেন এবং জান্নাতের উপযুক্ত হবেন, তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে দেয়া হবে। আর যারা জালেম ও অপরাধী সাব্যস্ত হবে, তারা দোযখের শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে। তাদেরকে দোযখে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে দেয়া হবে। এটা মৃত্যুর পর দ্বিতীয় মনযিল, যার নাম 'কিয়ামত ও হাশর'।

তারপর জান্নাতীরা চিরদিনের জন্য জান্নাতেই বসবাস করতে থাকবে। যেখানে শুধু আরাম-আয়েশের সুখময় জীবন। সেখানে এমন বিলাসী উপকরণ থাকবে, যা দুনিয়াতে কেউ কোন দিন দেখেওনি, শুনেওনি। আর দোযখীদেরকে দোযখে ফেলে দেয়া হবে। সেখানে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে। শুধু দুঃখ-কষ্টের অনন্ত জীবন। এই বেহেশত-দোযখ মৃত্যুর পর তৃতীয় এবং সর্বশেষ মনযিল। এই মনযিলে বেহেশতীরা অনন্তকাল আর দোযখীরাও অনন্তকালব্যাপী যার যার আমল অনুযায়ী বেহেশতে বা দোযখে অবস্থান করতে থাকবে। যে যুগের আর পরিসমাপ্তি ঘটবে না।

মৃত্যুপরবর্তী যুগ সম্পর্কে আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং বিশেষ করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলে গিয়েছেন, কুরআন-হাদীসে যা ইরশাদ হয়েছে, এতক্ষণ তারই সারাংশ আলোচিত হলো। এর সাথে কয়েকটি আয়াত ও হাদীস সন্নিবেশিত হলো।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ.

'প্রত্যেক প্রাণকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে, অতঃপর তোমরা সবাই আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে।'

(সূরা আনকাবুত)

মহান আল্লাহ অন্যত্র ইরশাদ করেন—

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

'প্রত্যেক প্রাণকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে, আর তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময় কিয়ামতের দিন পুরোপুরি দেয়া হবে।' (সূরা আলে ইমরান)

কিয়ামত এবং তার বিভীষিকাময় অবস্থার বর্ণনা কুরআনের অনেক জায়গায়ই করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত এখানে পরিবেশন করা হলো।

ইরশাদে ইলাহী—

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَ مَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَ لٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ.

'হে লোকসকল! তোমরা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করো। কিয়ামতের কম্পন ভীষণ ভয়ংকর জিনিস। যেদিন তোমরা তা দেখবে, ঐদিন প্রত্যেক দুগ্ধদানকারিণী মাতা তার দুগ্ধপানকারী

শিশু সন্তানকে ভুলে যাবে। গর্ভধারিণীর গর্ভস্থিত সন্তানের গর্ভপাত ঘটবে। তোমরা সবাইকে নেশাগ্রস্তের মতো দেখতে পাবে। মূলত তারা নেশাগ্রস্ত হবে না বরং আল্লাহ তাআলার শাস্তি ভীষণ কঠিন (ব্যাস, এ ভয়েই লোকেরা উন্মাদপ্রায় হয়ে যাবে।)' (সূরা হজ্জ)

'সূরা মুযযাম্মিলে' কিয়ামতের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ ছে—

يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَ كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلاً.

'যখন পৃথিবী, পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তূপ।' (সূরা মুযযাম্মিল)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا.

'যেদিন বালককে করে দিবে বৃদ্ধ।' (সূরা মুযযাম্মিল)

অন্য এক সূরায় ইরশাদ হয়েছে—

فَاِذَا جَائَتِ الصَّاخَّةُ. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَ اُمِّهٖ وَ اَبِيْهِ وَ صَاحِبَتِهٖ وَ بَنِيْهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ. شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ وُ جُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ.

'অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে, সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভাইয়ের কাছ থেকে, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে, সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলিধূসরিত। তাদেরকে কলংক আচ্ছন্ন করে রাখবে।' (সূরা আবাসা)

কিয়ামতের দিন সবাই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার সামনে

উপস্থিত হবে। কেউ কোথাও লুকোতে পারবে না। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন—

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

'ঐদিন তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, তোমাদের কেউই লুকিয়ে থাকতে পারবে না।' (সূরা আল-হাক্কাহ)

সূরা কাহাফে ইরশাদ হয়েছে—

وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً وَّ حَشَرْنَا هُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا . وَ عُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَ وُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَ يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَّ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا .

'যেদিন আমি পর্বতসমূহকে হটিয়ে দেব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর, আর আমি মানুষকে একত্রিত করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না। তারা সারিবদ্ধভাবে আপনার প্রভুর সামনে উপস্থিত হবে এবং বলা হবে, তোমরা আমার কাছে এসে গেছ, যেমন তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। তোমরা তো বলতে, আমি তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুত সময় উপস্থিত করব না। আর আমলনামা সামনে রাখা হবে, তাতে যা আছে, তার কারণে আপনি অপরাধীদের ভীতসন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে, হায় আফসোস ! এ কেমন আমলনামা ? এ যে ছোট-বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি—সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারো প্রতি জুলুম করবেন না।'

কিয়ামতের দিন মানুষের হাত-পা এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার

কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।

সূরা ইয়াসীনে ইরশাদ হয়েছে—

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

'আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দেব আর তাদের হাত-পা কথা বলবে, আর তারা যা করত, তার সাক্ষ্য দেবে।'

মোটকথা কিয়ামতের দিন যা যা ঘটবে, কুরআন মাজীদ সবিস্তারে তা বর্ণনা দিয়েছে। অর্থাৎ ভূকম্পন হওয়া, দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া, পাহাড়-পর্বতসমূহ তুলোর মত উড়তে থাকা, সমগ্র মানবজাতিকে পুনরোত্থিত করা, হিসাব-কিতাবের জন্য হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়া. সেখানে প্রত্যেকের সামনে আমলনামা উপস্থাপিত হওয়া, প্রত্যেকের শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বয়ং তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা, অতঃপর শাস্তি বা পুরস্কারের ফয়সালা হওয়া এবং বেহেশত বা দোযখে প্রবেশ করা. এসব বিষয়ের আলোচনা কুরআনের কোন কোন সূরাতে এত বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে যে, তা পাঠ করলে কিয়ামতের একটি ভয়াবহ চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যে ব্যক্তি চায় যে, কিয়ামতের দৃশ্য তার সামনে এমনভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে যেন সে তার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, তবে সে কুরআনে কারীমের সূরা ইযাশ্‌শামসু, ইযাস্ সামাউন ফাতারাত ও ইযাস্ সামাউন শাক্‌কাত অধ্যয়ন করে।'

এখন বরযখী জীবন ও কিয়ামত সম্পর্কিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করা হচ্ছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'তোমাদের মধ্যে যখন কেউ মৃত্যুবরণ করে, তখন কিয়ামত পরবর্তী তার অবস্থান—বেহেশত বা দোযখ, প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যার পর সামনে আনা হয় আর বলা হয়, এটাই

তোমার গন্তব্যস্থল, যেখানে তোমাকে পৌছতে হবে।'

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাঁর বক্তৃতায় কবরের পরীক্ষা এবং সেখানকার অবস্থার চিত্রায়ন করলেন, তখন উপস্থিত সবাই ভয়ে চিৎকার দিতে থাকেন।'

অনেক হাদীসে কবরের অবস্থা, প্রশ্নোত্তর এবং সেখানের শাস্তি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। পরিসর সংক্ষিপ্ত করার জন্য এখানে শুধু দুটো হাদীস উপস্থাপন করা হল, এখন কিয়ামত সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে। একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন—

'মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশে যখন কিয়ামতের প্রথম শিঙ্গা-ফুৎকার দেয়া হবে, তখন সব মানুষ বেহুঁশ হয়ে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়বে। অতঃপর দ্বিতীয় ফুৎকার দেয়া হলে সবাই জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, তারপর নির্দেশ ঘোষিত হবে—তোমরা সবাই তোমাদের মহান প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য চলতে থাক, অতঃপর ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে, ওদেরকে থামিয়ে দাঁড় করাও। এখানে তাদেরকে তাদের পার্থিব জীবন সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।'

অন্য এক হাদীসে এসেছে—

'একজন সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকে কিভাবে দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন? দুনিয়াতে কি এর কোন নজির আছে? জবাবে তিনি ইরশাদ করেন ঃ তোমরা কখনো কি এমন ফসলী জমির পাশ দিয়ে অতিক্রম করোনি? যার ফসল শুকিয়ে গিয়েছে, পত্রপল্লবের শ্যামল চেহারা হারিয়ে গিয়েছে, আবার কিছুদিন পর ঐ একই ফসল তরতাজা হয়ে উঠেছে, শ্যামল চেহারা ফিরে পেয়েছে, সজীব তরুলতাগুলো বাতাসে হেলেদুলে চলছে? (সাহাবী বলেন) আমি বললাম ঃ হাঁ, এমন তো হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইরশাদ করেন ঃ এটাই পুনর্জীবনের স্পষ্ট উদাহরণ। এভাবেই আল্লাহ তাআলা মৃতদেরকে আবার জীবিত করবেন।'

আরেকটি হাদীসে এসেছে—

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শরীফের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন— يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا (কিয়ামতের দিন জমিন তার সব খবর বর্ণনা করবে।) হুযূর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এর মর্মার্থ বুঝতে পেরেছ? সাহাবায়ে কিরাম বলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। হুযূর ইরশাদ করেন ঃ এর অর্থ হল, কিয়ামতের দিন জমিন আল্লাহর প্রত্যেক বান্দা-বান্দীর ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে, তারা এ জমিনের উপর কি কি কাজ করেছে, অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশে জমিন ঐদিন বলবে যে, অমুক বান্দা, অমুক বান্দী অমুক দিন আমার উপর এ কাজ করেছে।'

অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে—

'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বান্দাদেরকে বলবেন, আজ তোমরা নিজেরাই নিজেদের সাক্ষী। আমার লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতারাও উপস্থিত আছে। এসব সাক্ষ্য যথেষ্ট। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে বান্দাদের মুখে তালা মেরে দেয়া হবে। মুখে কিছুই বলতে পারবে না। তার অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—হাত, পা ইত্যাদিকে নির্দেশ দেয়া হবে, তোমরা বল। তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের কৃতকর্মের দাস্তান শুনিয়ে দেবে।'

অন্য একটি হাদীসের সারমর্ম হল—

'এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে কিছু গোলাম আছে। এরা কখনো কখনো দুষ্টুমী করে। কখনো তারা আমার সাথে মিথ্যা কথা বলে। কখনো আমানতে খিয়ানত করে। আমি এসব ত্রুটির জন্য কখনো রাগান্বিত হই, গালমন্দ

করি আবার কখনো মারধরও করি, কিয়ামতের দিন আমার কী পরিণতি হবে? প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ঠিকঠিক ইনসাফ করবেন। যদি তোমার সাজা তাদের ত্রুটির বরাবর হয় তবে তুমি কিছু পাবেও না আর তোমাকে কিছু দিতেও হবে না। যদি তোমার সাজা তাদের ত্রুটির তুলনায় কম হয়, তবে তোমার বাড়তি পাওনা আদায় করে দেয়া হবে। আর যদি তোমার সাজা তাদের ত্রুটির তুলনায় বেশী হয়ে যায়, তবে তোমার থেকে তাদের পাওনা চুকিয়ে দেয়া হবে। এটা শুনে ঐ ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগল। অতঃপর সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে তো আমার জন্য এটাই উত্তম যে, আমি তাদেরকে আলাদা করে দেব। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি তাদের সবাইকে আযাদ (মুক্ত) করে দিলাম।'

এই হাদীসে এটাও এসেছে—

'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে কুরআনের এ আয়াত পড়ে শুনান—

وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَ كَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ.

আয়াতখানার মর্মার্থ হল—

'আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লা প্রতিষ্ঠা করব। কারো সাথে সেখানে জুলুম করা হবে না। যদি কারো কোন আমল বা অধিকার সরিষা দানা বরাবরও থাকে, তবে আমি তা সামনে এনে হাজির করব। আর আমি হিসাব নেয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট।'

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দিন, যেন মৃত্যু, মৃত্যুর পর এবং কিয়ামত সম্পর্কে কুরআন হাদীস আমাদেরকে যা বলেছে, আমরা তা স্মরণ রাখি। দুনিয়ার মোহে ভুলে না বসি।

সবক ঃ ১৬

বেহেশত ও দোযখ

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন হবে ফয়সালার দিন। যাঁরা মুমিন হবেন, যাঁদের কাজ-কর্ম দুনিয়াতে খুব ভাল ছিল, তাঁরা সেদিন কোন শাস্তির সম্মুখীন হবেন না। তাঁরা কিয়ামতের ভীষণ ভয়াবহ দিনেও মহান আল্লাহ তাআলার আরশের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পাবেন। আর খুব তাড়াতাড়ি তাঁদের হিসাব-নিকাশ সেরে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কিছুলোক এমন হবে, তারা কিছু সাজা ভোগ করে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। কিয়ামতের দিন কিছু কষ্ট সহ্য করে কিছুদিন দোযখের শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মোটকথা, যার মধ্যে সামান্য ঈমানও থাকবে, সে শেষ পর্যন্ত একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে। দোযখে চিরদিনের জন্য শুধু তারাই থেকে যাবে, যারা দুনিয়া থেকে কুফর ও শিরকের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

মোদ্দাকথা, জান্নাত হল, ঈমান ও সৎকাজ, মহান আল্লাহ তাআলার একান্ত আনুগত্যের মহাপুরস্কার। আর দোযখ—কুফুরী, শিরকী, মহান আল্লাহ তাআলার সাথে গাদ্দারী ও তাঁর প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশের মহাশাস্তি। জান্নাতের নিয়ামতরাজি, সেখানকার আয়েশী উপকরণ এবং দোযখের দুঃখ-দুর্দশা ও শাস্তির বর্ণনা কুরআন হাদীসে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি আয়াত ও হাদীস আমরা এখানে উপস্থাপন করছি।

সূরা আলে ইমরানে ইরশাদ হয়েছে—

لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ .

'মুত্তাকীদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে ঐ জান্নাতসমূহ রয়েছে, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হয়েছে, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে, আর পুতপবিত্র স্ত্রীবা থাকবে, আর

থাকবে মহান আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে খুব ভালভাবেই দেখেন। (কারো কোন অবস্থা তার কাছে লুকায়িত নয়।)'

সূরা ইয়াসীনে ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِى شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ هُمْ وَ أَزْوَاجُهُمْ فِى ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُوْنَ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّ لَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ.

'এদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে, তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে। করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে—'সালাম'।'

সূরা যুখরুফে ইরশাদ হয়েছে—

وَ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَ أَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

'আর জান্নাতে সেসব থাকবে যা মানুষের মন চাইবে আর তাদের চোখ জুড়িয়ে যাবে। আর (হে আমার নেককার বান্দারা!) তোমরা চিরদিন এ জান্নাতেই বসবাস করতে থাকবে।'

সূরা মুহাম্মদে জান্নাতের অবস্থার সম্যক ধারণা দিতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে—

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَا أَنْهٰرٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَ أَنْهٰرٌ مِنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَ أَنْهٰرٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ وَ أَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَ لَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ.

'পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার অবস্থা হল, তাতে আছে পানির নহব, নির্মল দুধের নহর, যার

স্বাদ অপরিবর্তনীয়। পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্য আছে, রকমারী ফলমূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা।'

সূরা হিজরে জান্নাতের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়—

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ.

'জান্নাতবাসীদেরকে কোন ধরনের কষ্ট স্পষ্ট করতে পারবে না।'

জান্নাতে শুধু আরাম আর আরাম। অকল্পনীয় বিলাসবহুল জীবন সেখানে হবে। কোন ধরনের দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা-ভাবনা সেখানে থাকবে না। এতো গেল জান্নাতীদের অবস্থা। এখন দেখা যাক, দোযখ সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য কি?

কুরআনে কারীমে দোযখ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ.

'আর যার পাল্লা হালকা হবে, এরা তো তারাই যারা (কুফরী শিরক অথবা অসৎকর্মশীল) নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা জাহান্নামে অবস্থান করবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বিভৎস আকার ধারণ করবে।'

(সূরা মুমিনুন)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَ اِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ.

'আমরা জালিমদের (কুরআনের ভাষায় সর্ববৃহৎ জুলুম হল—কুফর ও শিরক। আসল জালিম কাফির ও মুশরিক) জন্য দোযখ তৈরী করেছি। যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে, যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায়

পানীয় দেয়া হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে।' (সূরা কাহাফ)
অন্য এক জায়গায় ইরশাদ হয়েছে—

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُّصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيْمَ. يُصْهَرُبِهِ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَ الْجُلُوْدُ وَ لَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ. كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ.

'অতএব যারা কাফির তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্য আছে লোহার হাতুড়ি। তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে ঃ দহন শাস্তি আস্বাদন কর।'

(সূরা হজ্জ)

কুরআন মজীদের শত শত আয়াতে দোযখের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা এর চেয়ে আরো সবিস্তারে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে অল্প কয়েকটি আয়াত পেশ করা হল। এখন বেহেশত দোযখ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস আমরা শুনে নেই। একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ তাআলার বাণী নিজ ভাষায় এভাবে উপস্থাপন করেন—

'আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দার জন্য জান্নাতে এমন সব বিলাসসামগ্রী তৈরী করে রেখেছি যা সে কোনদিন চোখে দেখেনি, (এমন কাহিনী) কানেও শোনেনি, কোন মানুষের কল্পনাতেও এমন খেয়াল কোনদিন আসেনি।'

নিশ্চয় জান্নাতীরা এমন পরিচ্ছন্ন ও মজাদার খাবার পাবে, যেসব ফলফলাদি তাদেরকে পরিবেশন করা হবে, পান করার এমন কোমল সুপেয় পানীয় তারা পাবে, পরিধানের জন্য এমন চাকচিক্যময় পোশাক তাদেরকে দেয়া হবে, বসবাসের জন্য এমন শাহী মহল ও দৃষ্টিনন্দন

বাগান আর মনোরঞ্জনের জন্য সুন্দরী রমণী (হুর) দেয়া হবে, এছাড়াও আনন্দফুর্তি আরাম-আয়েশের আরো কত যে বিলাস সামগ্রী তাদেরকে পরিবেশন করা হবে। উপরোক্ত হাদীস থেকে তার কিছুটা হলেও ধারণা লাভ করা যায়। আসলে জান্নাতের বিলাসসামগ্রী কেমন হবে তা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। আমরা এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি।

অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যখন জান্নাতীরা জান্নাতে পৌঁছে যাবে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ঘোষক ঘোষণা করবে, এখন থেকে তোমরা সর্বদা সুস্থ থাকবে, অসুস্থতা আর কোনদিন তোমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না, এখন থেকে তোমরা চিরঞ্জীব। মৃত্যু আর তোমাদের দুয়ারে হানা দিতে আসবে না, এখন থেকে তোমরা চির যুবক থাকবে। বার্ধক্যের দূর্বলতা আর তোমাদের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না, এখন থেকে তোমরা চিরসুখী। কোন ধরনের দুঃখ-কষ্ট আর তোমাদের কাছে আসবে না।'

সবচাইতে বড় নিয়ামত যা জান্নাতীরা জান্নাতে গিয়ে পাবে, তা হল—মহান আল্লাহ তাআলার দিদার বা দর্শন। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যখন জান্নাতী লোকেরা জান্নাতে পৌঁছে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলবেন ঃ তোমাদেরকে যেসব নিয়ামত দেয়া হয়েছে, তার চেয়ে আরো বেশী কি তোমরা চাও? তারা বলবে ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদের চেহারা আলোকিত করেছেন, আমাদেরকে দোযখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন, জান্নাত দান করেছেন। (যেখানে সবকিছুই আছে আমরা আর কি চাইতে পারি?) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ অতঃপর পর্দা উঠিয়ে নেয়া হবে আর সবাই স্পষ্ট আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পাবে। তখন জান্নাতের অন্য সব নিয়ামতের তুলনায় মহান আল্লাহর অতুলনীয় দর্শন সবচেয়ে বড় নিয়ামত মনে হবে।'

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও এসব নিয়ামত দানে বাধিত করুন।

একখানা হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের আরাম-আয়েশ ও দোযখের দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন—

'কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে সামনে উপস্থিত করা হবে, যে দুনিয়াতে সবচাইতে বেশী বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন করেছে, কিন্তু তার কপাল খারাপ! সে দোযখের উপযুক্ত হবে। তাকে কিছুক্ষণের জন্য দোযখে দিয়ে, সাথে সাথে বের করে আনা হবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কি কখনো সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করেছ? সে বলবে—হে পরওয়ারদিগার! তোমার কসম! আমি কখনো আরাম-আয়েশ দেখিনি। আরো এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যে দুনিয়াতে খুবই দুঃখে-কষ্টে জীবনযাপন করেছে, কিন্তু সে জান্নাতের অধিকারী হবে। অতঃপর তাকে জান্নাতের আবহাওয়ায় একটু ঘুরিয়ে সাথে সাথে বের করে আনা হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কি কখনো দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছ? সে বলবে—হে আমার পালনকর্তা! না, তোমার কসম! আমার কখনো দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়নি। দুঃখ-কষ্ট আমি দেখিইনি।'

মূলত জান্নাতে আল্লাহ তাআলা এমনি আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা রেখেছেন যে, দুনিয়াতে ভীষণ দুঃখে-কষ্টে জীবন-যাপনকারী ব্যক্তিও এক মিনিটের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করেই পেছনের সব কথা ভুলে যাবে। আর দোযখে এমন ভয়ংকর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন যে, দুনিয়াতে অকল্পনীয় আরাম-আয়েশ ভোগ করে এসেও এক মিনিট দোযখের শাস্তি পেয়ে মনে করবে যে, সে কখনো কোন আরাম-আয়েশের মুখই দেখেনি।

দোযখের শাস্তির ভয়ংকর অবস্থা শুধু এই একটি হাদীস থেকে অনুমান করা যায়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'দোযখে যে ব্যক্তির সবচেয়ে কম শাস্তি হবে, তার শাস্তির ধরণ হবে—তার পায়ে আগুনের জুতো পরিয়ে দেয়া হবে। যার গরমে

তার মগজ টগবগিয়ে ফুটতে থাকবে। যেভাবে চুলোর উপর খাবার ফুটানো হয়।'

দোযখীদেরকে যা কিছু খাবার–দাবার পরিবেশন করা হবে, তার বর্ণনা সম্বলিত কুরআনের আয়াত ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে দুটো হাদীস আরো উপস্থাপন করা হল। একখানা হাদীসে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'দোযখীদেরকে পানীয় হিসেবে যে গলিত পুঁজ দেয়া হবে, তার এক বালতি পরিমাণ যদি দুনিয়াতে ঢেলে দেয়া হয় তবে পুরো দুনিয়া'এর দুর্গন্ধে ভরে যাবে।'

অন্য এক হাদীসে দোযখীদের খাদ্য 'যাক্কুম' সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যদি যাক্কুম ফলের একফোটা রস দুনিয়াতে পড়ে, তবে দুনিয়াতে যা খাদ্যদ্রব্য আছে সব নষ্ট হয়ে যাবে। এখন চিন্তা করে দেখ যাকে যাক্কুম খেতে হবে, তার কী অবস্থা দাঁড়াবে।'

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এবং সব ঈমানদার ভাইদেরকে দোযখের ছোট বড় শাস্তি থেকে মুক্তি দান কর।

কবর জীবন, কিয়ামত, বেহেশত ও দোযখ সম্পর্কে কুরআনে কারীম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু আমাদেরকে বলেছেন এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। কসম আল্লাহর! এ সবই সত্য। মৃত্যুর পর আমরা এসব স্বচক্ষে অবলোকন করব। কুরআন হাদীসে কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা এতো বিস্তারিতভাবে বারবার করা হয়েছে, যেন আমরা দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচার চেষ্টা করি এবং জান্নাত লাভ করার চেষ্টা করতে উৎসাহিত হই।

এ দুনিয়া ক্ষণিকের। একদিন না একদিন অবশ্যই আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। সেখানে আমাদেরকে আমাদের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে। অতঃপর আমাদের চিরন্তন ঠিকানা নির্ধারিত হবে। হয় জান্নাত, নয়তো ভীষণ আযাবের ভয়ংকর আবাসস্থল—জাহান্নাম!

সময় এখনো আছে, পেছনের পাপরাশি থেকে তাওবা করে সামনের

জীবনকে সুন্দর করে দোযখ থেকে বাঁচার। আসুন! আমরা এখনই গভীর চিন্তা–ফিকির করি, জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে জীবনে পরিবর্তন আনি। খোদা না করুন! যদি জীবনটা এমন অলসতায় কেটে যায়, তবে মৃত্যুর পর আফসোসের আর সীমা থাকবে না, দোযখের শাস্তি ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারব না।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَ مَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَ عَمَلٍ، وَ نَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَ مَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَ عَمَلٍ.

সবক ঃ ১৭

আল্লাহর যিকির

ইসলামের শুধু শিক্ষাই নয় বরং ইসলামের অর্থই হল, আল্লাহর বান্দা তার পুরো জীবনটাই আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক পরিচালনা করবে। সর্বাবস্থায় প্রত্যেক কাজে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করবে। এ অবস্থাটা তখনই বাস্তবে প্রতিফলিত করা সম্ভব, যখন বান্দা সবসময় আল্লাহর ধ্যান-খেয়ালে থাকবে। তার অন্তরে মহান আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও ভালবাসা পুরোপুরি বসে যাবে। এজন্য ইসলামের একটি শিক্ষা হল, বান্দা বেশী বেশী অল্লাহর যিকির করবে। তার তাসবীহ্-তাহ্লীল ও প্রশংসা বর্ণনায় জিহ্বাকে চালু রাখবে। অন্তরে আল্লাহ তাআলার মহব্বত ও বড়ত্ব সৃষ্টি করার এটা একটা পরীক্ষিত আমল। এটা তো সাধারণ কথা, মানুষ যার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের ধারণায় সবসময় ডুবে থাকবে, যার সৌন্দর্যের গান রাতদিন গাইতে থাকবে, তার অন্তরে তাঁরই ভালবাসা ও মহত্ত্ব অবশ্যই সৃষ্টি হয়ে যাবে। আর দিন দিন তা আরো বাড়তে থাকবে।

মোটকথা, এটা একটা স্পষ্ট বিষয় যে, বেশী বেশী যিকিরের দ্বারা ইশ্ক ও ভালবাসার চেরাগ জ্বলে উঠে এবং তার অগ্নিশিখা আরো তেজোদীপ্ত হয়ে উঠে। এটাও একটা স্পষ্ট বিষয় যে, পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং গোলামীর ঐ জীবন যার নাম 'ইসলাম', সেটা শুধুমাত্র ভালবাসার দ্বারাই সৃষ্টি হয়। শুধু ভালবাসা এমন এক শক্তি যা সত্যিকার প্রেমিককে তার প্রেমাস্পদের অনুগত ও অনুসারী বানিয়ে ছাড়ে।

এজন্য কুরআনে কারীমে বেশী বেশী করে আল্লাহর যিকির করার জন্য তাগিদ করা হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই যিকিরের অনেক ফযীলত ও পুরস্কারের কথা বর্ণনা করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا.

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর যিকির কর বেশী করে, আর তার পবিত্রতা বর্ণনা কর সকাল-সন্ধ্যা।' (সূরা আহযাব)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

'আর আল্লাহর যিকির কর বেশী করে, যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।' (সূরা জুমুআ)

বিশেষভাবে দুটো জিনিস এমন আছে, যাতে ব্যস্ত হয়ে, যার নেশায় মত্ত হয়ে মানুষ আল্লাহকে ভুলে বসে, তার একটি হল—ধনদৌলত, আর অপরটি হল—স্ত্রী-সন্তান।

এজন্য এ দুটো জিনিসে নাম উচ্চারণ করে স্পষ্টভাবে মুসলমানদেরকে সাবধান করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধনসম্পদ, স্ত্রীপুত্র যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে অন্যমনস্ক না করে দেয়। আর যে এমন করবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।' (সূরা মুনাফিকুন)

ইসলামে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। নিঃসন্দেহে এটাও আল্লাহর যিকির। বরং প্রথম শ্রেণীর যিকির। কিন্তু কোন ঈমানদারের জন্য শুধু নামাযকেই যিকির মনে করে যথেষ্ট ভাবা ঠিক নয়। নামায ছাড়াও অন্যসময় আল্লাহর যিকির করবে। ইসলামের স্পষ্ট বিধান হল, নামায ছাড়াও তোমরা যে অবস্থায় থাক, সে অবস্থায়ই আল্লাহকে স্মরণ কর, তাঁকে ভুলে যেয়ো না। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ.

'আর যখন তোমরা নামায পড়ে ফেল, তখন তোমরা শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়ে আল্লাহকে স্মরণ কর।' (সূরা নিসা)

এমনকি যারা আল্লাহর রাহে জিহাদের জন্য বের হয়েছে, তাদেরকেও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আল্লাহকে স্মরণ করার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদে ইলাহী—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

'হে ঈমানদারগণ! যখন কোন সৈন্যবাহিনীর সাথে তোমাদের মুকাবেলা হয়, তখন তোমরা দৃঢ়পদ থাক, আর আল্লাহকে খুব স্মরণ কর, যেন তোমরা সফলকাম হয়ে যাও।' (সূরা আনফাল)

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ঈমানদারদের সফলতার ক্ষেত্রে আল্লাহর যিকিরের বিশেষ দখল রয়েছে। সূরা মুনাফিকূনের আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, যারা আল্লাহর যিকির থেকে দূরে থাকে, আল্লাহকে ভুলে থাকে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত। সূরা রা'দের একটি আয়াতে যিকিরের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে—

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

'জেনে রাখ! আল্লাহর যিকিরেই অন্তরের প্রশান্তি নিহিত রয়েছে।'

কুরআনের এসব আয়াতের পর নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কয়েকটি হাদীসও শুনে নিই। একখানা হাদীসে এসেছে—

'প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, কিয়ামতের দিন কোন্ লোকেরা সর্বাধিক মর্যাদাশীল হবে? তিনি ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহর যিকিরকারী নারী-পুরুষ।'

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'আল্লাহর যিকিরকারী ও যারা যিকির করে না, তাদের উদাহরণ জীবিত ও মৃতের মত। (অর্থাৎ যিকিরকারীরা জীবন্ত, আর যারা যিকির করে না তারা মৃত।)'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'প্রত্যেক জিনিসেরই একটা দীপ্তি থাকে, আর অন্তরের দীপ্তি হল—আল্লাহর যিকির। আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে যিকিরের চাইতে অধিক শক্তিশালী আর কিছু নেই।'

যিকিরের মূলকথা ঃ

এখানে এ বিষয়টি ভাল করে বুঝে নেয়া উচিত যে, যিকিরের মূলকথা হল, মানুষ যেন আল্লাহকে ভুলে না যায়। সে যে অবস্থায় বা যে কাজেই থাকুক না কেন, সর্বাবস্থায় আল্লাহর কথা ও তার বিধানের খেয়াল রাখবে। যদিও এটা জরুরী নয় যে, সবসময় মুখে আল্লাহ-আল্লাহ যিকির করতে থাকবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার যেসব বান্দাদের এ অবস্থা হয়, তাদের মুখেও সর্বদা আল্লাহর যিকির থাকে এবং সাথে সাথে প্রত্যেক কাজে আল্লাহর বিধি-বিধান ও খেয়াল করে করে পালন করে। তাঁরা মৌখিক যিকির দ্বারা অন্তরে আল্লাহ তাআলার ধ্যান-খেয়ালের অলৌকিক একটা অবস্থা সৃষ্টি করে নেন। যদ্দ্বারা আল্লাহর সাথে তাদের আত্মিক সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এজন্য মৌখিক যিকির বেশী বেশী করা অত্যন্ত জরুরী। আজকাল আধুনিক শিক্ষিত লোকদের একটি ভীষণ ভুল ধারণা রয়েছে যে, তারা মৌখিক যিকিরকে অর্থহীন মনে করে। অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহে এ ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে এবং তিনি এর অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুশ্‌র (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—

'এক ব্যক্তি নবীজীর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল ! ইসলামের অনেক বিধি-বিধান রয়েছে, আপনি আমাকে এমন একটি বিধান বাতলে দিন, যাকে আমি দৃঢ়চিত্তে আঁকড়ে ধরে থাকব। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন—

لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله

'সবসময় তুমি তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর যিকির দ্বারা সিক্ত রাখ।'

প্রিয় নবীজীর শিখানো বিশেষ বিশেষ যিকির ঃ

উপরের যেসব আয়াত ও হাদীস উপস্থাপন করা হয়েছে, তা থেকে আল্লাহর যিকিরের গুরুত্ব ও ফযীলত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো বিশেষ বিশেষ যিকিরের বাক্য সন্নিবেশন করছি।

উত্তম যিকির ঃ

হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ('লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ')–এর যিকির সবচাইতে উত্তম যিকির।'

অন্য এক হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যখন কোন বান্দা পূর্ণ ইখলাসের সাথে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ('লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ') বলে, তখন এ বাক্যের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খুলে যায়। এমনকি তা আরশ পর্যন্ত পৌছে যায়। কিন্তু শর্ত হল বান্দা যেন কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।'

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'একবার হযরত মূসা (আঃ) মহান আল্লাহ তাআলার কাছে আবেদন করলেন, আমাকে এমন কিছু বলে দিন যদ্দ্বারা আমি আপনার যিকির করব। আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব পেলেন যে, 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মাধ্যমে আমার যিকির করতে থাক। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, হে আল্লাহ! এ যিকির তো সবাই করে। আমি বিশেষ কোন বাক্য জানতে চাচ্ছি। ইরশাদ হল, হে মূসা! যদি সাত আকাশ ও তার মধ্যকার সৃষ্টিরাজি এবং সাত জমিনকে এক পাল্লায় রাখা হয়, আর 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এক পাল্লায় রাখা হয়, তবে 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পাল্লা ভারি হয়ে যাবে।'

আসলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মর্যাদা এমনই। কিন্তু মানুষ এটাকে হালকা ভাবে। অধম আল্লাহর এক বিশেষ বান্দার কাছ থেকে শুনেছি, বিশেষ এক সময় তিনি অধমকে সম্বোধন করে বলেন—

'যদি কোন বিশ্বসেরা ধনী ব্যক্তি আমাকে বলে যে, তুমি আমার এ বিশাল ধনভাণ্ডার নিয়ে নাও আর তোমার একবার পাঠ করা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আমাকে দিয়ে দাও। তবে আমি ফকির তাতে মোটেও রাজি হব না।'

কোন অজ্ঞ ব্যক্তি হয়ত এটাকে অতিরঞ্জিত কথা ভাবতে পারে। কিন্তু সত্য কথা হল, মহান আল্লাহর দরবারে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র যে মর্যাদা ও মূল্য রয়েছে, কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ এর দৃঢ়বিশ্বাস দান করেন, তবে তার অবস্থা এমনই হবে। সে পুরো দুনিয়ার ধনভাণ্ডারের বিনিময়েও একবার পাঠ করা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দান করে দিতে রাজি হবে না।

কালিমায়ে তামজীদ (মর্যাদাশীল বাক্য) ঃ

হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'সর্বশ্রেষ্ঠ কথা ও সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য নিম্নোক্ত চারটি। যথা ঃ সُبْحَانَ اللهِ (সুবহানাল্লাহ), اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লাহ), لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ), اَللهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার)।'

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'আমার কাছে চারটি বাক্য—সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পুরো দুনিয়া থেকে প্রিয়, যেখানে সূর্য উদিত হয়।'

এ বাক্যটি (চারটি) আসলে সর্বব্যাপী একটি বাক্য। মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলীর সবদিক এ বাক্যে রয়েছে। কোন কোন হাদীসে আল্লাহু আকবারের পর 'লা-হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লাবিল্লাহ'ও বর্ণিত হয়েছে।

আমাদের একজন মহৎপ্রাণ বুযুর্গ এ বাক্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

এভাবে পেশ করতেন—

سُبْحَانَ اللهِ আল্লাহ তা'আলা সব ধরনের দোষ-ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র। আর ঐসব গুণাবলী থেকেও তিনি পবিত্র যা তার মহান মর্যাদাময় সত্তার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমূহ উত্তম ও পূর্ণতার গুণাবলীতে তিনি গুণান্বিত। সুতরাং সব প্রশংসার মালিক তিনিই। এটাই যখন তাঁর মর্যাদাময় অবস্থান যে, তিনি সব অপূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে পবিত্র এবং পূর্ণতা ও উত্তম গুণাবলী দ্বারা অলংকৃত, সুতরাং তিনিই আমাদের কাঙ্খিত প্রভু।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ আমরা শুধু তাঁরই অক্ষম ও দুর্বল গোলাম আর তিনিই সবার বড়।

اَللهُ اَكْبَرُ আমরা কোনভাবেই তার গোলামী তাঁর মর্যাদানুযায়ী পালন করতে পারব না। তাঁর মহান মর্যাদাশীল দরবার পর্যন্ত আমাদের পৌঁছে যাওয়া সম্ভব নয়, যদি তিনি আমাদেরকে সাহায্য না করেন।' لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

তাসবীহে ফাতিমী ঃ

প্রসিদ্ধ হাদীস ঃ হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) নিজের ঘরের সব কাজকর্ম নিজেই সম্পাদন করতেন। এমনকি নিজেই পাত্র ভরে ভরে পানি বয়ে নিয়ে আসতেন। নিজেই যাঁতা ঘুরিয়ে আটা পিষতেন। একবার তিনি নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছে আবেদন করলেন ঃ আমাকে আমার কাজে সহায়তার জন্য একজন খাদেমের ব্যবস্থা করে দিন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ আমি তোমাকে খাদেমের চেয়ে আরও ভাল জিনিস বলে দিচ্ছি। আর তা হল, তুমি প্রত্যেক নামাযের পর এবং শয়নকালে তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ', তেত্রিশবার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার' পাঠ করবে। এটা তোমার খাদেমের চেয়ে অনেক গুণ বেশী উপকার করবে।

অন্য এক হাদীসে এই তাসবীহের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

'যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং শেষে একবার

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

পাঠ করবে, তার গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।'

দুটো ছোট তাসবীহ ঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় একশত বার— سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন অন্য কোন ব্যক্তি তার চেয়ে বেশী সওয়াবের ভাণ্ডার নিয়ে আসতে পারবে না। শুধু সেই আসবে যে এটা আমল করেছে অথবা এর চেয়েও বেশী করেছে।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'দুটো বাক্য এমন আছে, যা পড়তে খুবই সহজ, আমলের (ওজনের) পাল্লায় তা খুবই ভারী হবে এবং তা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়। বাক্য দুটো হল—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

যিকিরের জন্য আরো অনেক তাসবীহ ও বাক্যসমূহ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হল। যদি আল্লাহর কোন বান্দা শুধু এগুলো বা এর কয়েকটিকে আমলে পরিণত করে, এগুলো পাঠে অভ্যাস গড়ে তুলে, তবে তার জন্য যথেষ্ট।

যিকিরের ব্যাপারে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তাহল, পরকালে সওয়াব ও প্রতিদান পাওয়ার জন্য বিশেষ কোন কায়দা-কানুন নেই, বান্দা যিকিরের যে কোন শব্দ পূর্ণ ইখলাসের সাথে, সওয়াবের

নিয়তে যখন যে পরিমাণ পাঠ করবে, ইনশাআল্লাহ সে তার পূর্ণ সওয়াব ও প্রতিদান লাভ করবে। কিন্তু মাশায়েখবৃন্দ অন্তরে বিশেষ অবস্থা সৃষ্টির জন্য, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি করার জন্য, অন্তরে আল্লাহর সদা উপস্থিতির (.حضوری) অনুভূতি তৈরী করার জন্য অথবা আত্মিক বিশেষ রোগের চিকিৎসা স্বরূপ বিশেষ পদ্ধতিতে যে আযকার বাতলে দেন, তাতে সংখ্যা ও পদ্ধতির পূর্ণ অনুকরণ করা আবশ্যক। কেননা যে উদ্দেশ্যে এসব যিকির করা হয়, তা ঐ পদ্ধতিতেই অর্জন করা যায়। এর একটি সহজ উদাহরণ হল, যদি কোন ব্যক্তি শুধু সওয়াবের জন্য আলহামদু শরীফ বা কুরআন শরীফের অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করে, তাতে কোন অসুবিধা নেই যে, একবার সকালে তিলাওয়াত করল, একবার দুপুরে তিলাওয়াত করল তেমনি দু-চারবার রাতে তিলাওয়াত করল। কিন্তু যদি সে এসব সূরা হিফয (মুখস্ত) করতে চায়, তবে তাকে বিশেষ নিয়ম পদ্ধতি মেনে পাঠ করতে হবে। যেমন একই বসায় একটি সূরা বিশবার তাকে দেখে পড়তে হবে। মুখস্ত হয়ে গেলে আবার মুখস্ত বিশবার তিলাওয়াত করবে। বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ না করলে হিফয হবে না। একই পার্থক্য সাধারণ যিকিরে এবং বিশেষ যিকিরের মধ্যে। সাধারণ যিকির হল, যা শুধু সওয়াবের জন্য করা হয়। আর বিশেষ যিকির হল যা মাশায়েখবৃন্দ মুরীদদেরকে যে যিকিরের বিশেষ পদ্ধতি বাতলে দেন।

অনেকে এই পার্থক্য না বুঝে উদভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এজন্য সংক্ষিপ্তভাবে এটা এখানে বর্ণনা করা হল।

কুরআন শরীফের তিলাওয়াত ঃ

কুরআন মাজীদের তিলাওয়াতও আল্লাহর নিকট যিকির।[১] বরং উচ্চ

---

১. আজকাল অনেকে মনে করেন অর্থ না বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করা একটা অনর্থক কাজ। অথচ একমাত্র কুরআনেরই এটা বৈশিষ্ট্য যে, এটা না [illegible] শুধু পাঠ করলেই একেকটি অক্ষরের বিনিময়ে কমপক্ষে দশটি সওয়াব পাওয়া যায়। সুতরাং এটা একটা স্বতন্ত্র ইবাদত। হাঁ, বুঝে-বুঝে তিলাওয়াত করা এবং আয়াতসমূহে চিন্তা গবেষণা করা, এটা উচ্চ পর্যায়ের অতিমূল্যবান আমল। এতে সওয়াবও বেশী।

পর্যায়ের যিকির।

একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'মহান আল্লাহ তাআলার বাণী কুরআন মাজীদের মর্যাদা এমন, যেমন মহান আল্লাহ তাআলার মর্যাদা তাঁর সৃষ্টিরাজির উপর।'

অন্য এক হাদীসে এসেছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের একটি অক্ষর পাঠ করবে, সে একটি সওয়াব পাবে। আর ঐ একটি সওয়াব দশটি সওয়াবের সমতুল্য। অতঃপর নবীজী বলেন ঃ আমি এটা বলছি না যে, 'আলিফ–লাম–মীম' একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর।'

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'হে লোকসকল! কুরআন তিলাওয়াত কর। কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকারীর জন্য (মুক্তির) সুপারিশ করবে।'

যিকির সংক্রান্ত কিছু জরুরী কথা ঃ

(১) যারা যিকির করতে করতে অভ্যাস বানিয়ে ফেলেন, তাদের জন্য তো যিকির করা কোন কষ্টসাধ্য কাজ থাকে না। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণের জন্য যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়া এবং এর বরকত ও উপকারিতা লাভ করতে হলে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। তার জন্য সময় নির্ধারণ করতে হবে। কী পরিমাণ করবে তার সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য আল্লাহওয়ালাদের পরামর্শ নেয়া উচিত। উপরোল্লেখিত যিকিরগুলো থেকে যা যা ভাল লাগে নির্ধারণ করে নেবে। তেমনি কুরআন তিলাওয়াতেরও একটি বিশেষ সময় নির্ধারণ করে নিতে হবে।

(২) যেসব বাক্যের যিকির করা হবে, যথাসম্ভব তার অর্থের দিকে খেয়াল রাখবে। মহান আল্লাহ তাআলার ভালবাসা ও বড়ত্বের অনুভূতি

নিয়ে যিকির করবে। আর আল্লাহ্ তাআলা আমার কাছেই আছেন, আমার যিকির শুনছেন, আমাকে দেখছেন—এ দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে যিকিরে আত্মনিয়োগ করবে।

(৩) যিকিরের জন্য উযূ জরুরী নয়। উযূ না থাকলেও নির্দ্বিধায় যিকির করা যায়। যিকিরের জন্য যে ওয়াদা রয়েছে তা উযূ ছাড়াও ইনশাআল্লাহ পাওয়া যাবে। তবে উযূ করে নিলে যিকিরের আলাদা একটা প্রভাব যিকিরকারী অনুভব করবে।

(৪) ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, কালিমায়ে তামজীদ অর্থাৎ—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ.

খুবই মূল্যবান ও পরিপূর্ণ একটি বাক্য। বাক্যটিতে সবকিছুই আছে। এটাকে পাঠ করার রুটিন করে নেয়া উচিত। অধিকাংশ আল্লাহওয়ালাকে দেখা যায় যে, তাঁরা সাধারণ আল্লাহর পথসন্ধানকারীদেরকে এ বাক্যটিকে রুটিনমাফিক পাঠ করার জন্য বলে থাকেন। এর সাথে ইস্তিগফার (আস্তাগফিরুল্লাহ) ও দরূদ শরীফও পড়তে বলেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর নামের যিকির করে অন্তরকে আলোকিত ও জিহ্বাকে সজীব রাখার তাওফীক ও শক্তি দান করুন। যিকিরের আলোতে যেন আমরা আলোকিত হতে পারি, এর প্রভাব যেন আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে, আমরা যেন এর বরকত ও প্রতিদান লাভে ধন্য হই।

চোখের মুক্তাবারীতে আলোকিত করব
রাতের গহীন অন্ধকার—
স্মরণে স্মরণে প্রেমাস্পদের,
তাঁর প্রেমের সাগরে ডুবে থাকাই
হবে ঘুম আমার, যিনি আমার বন্ধু বিপদের।

সবক ঃ ১৮

দুআ

এটাতো সর্বজনস্বীকৃত কথা যে, এ মহাবিশ্বের শৃংখলিত কার্যক্রম মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই পরিচালিত হচ্ছে। সবকিছুর লাগাম তাঁর হাতেই। তিনি সব শক্তির কেন্দ্রবিন্দু। তাহলে ছোট–বড় সব প্রয়োজনেই তাঁরই কাছে হাত পাতা একদম যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার। এজন্যই সকল ধর্মাবলম্বীরা তাদের প্রয়োজনের সময় আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করে। কিন্তু ইসলামে এ ব্যাপারে বিশেষ নিয়ম পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে এবং এর দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের এক জায়গায় ইরশাদ হয়েছে—

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

'আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমার কাছে দুআ কর, আমি তা কবুল করব।'

অন্যত্র ইরশাদ করেন—

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّىْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ.

'(হে নবী আপনি) বলুন, যদি তোমরা দুআ না কর, তবে আমার প্রতিপালকের এর কোন পরওয়া নেই।'

দুআ করার নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে এ আস্থাও প্রদান করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের অতি নিকটে রয়েছেন। তিনি তাদের দুআ শোনেন এবং কবুল করেন।

ইরশাদে ইলাহী—

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

'আর হে নবী! যখন তোমার কাছে আমার বান্দা আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, তখন (তাদেরকে বল) যে, আমি তাদের

কাছেই আছি, দুআকারী যখন আমার কাছে দুআ করে, তখন আমি তার জবাব দিই।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, নিজের প্রয়োজনে আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়া, দু' হাত তুলে দুআ করা উচ্চ পর্যায়ের একটি ইবাদত। শুধু তাই নয়, এটা ইবাদতের প্রাণ এবং তার মগজ। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে—

'দুআ একটি ইবাদত।'

অন্য একটি হাদীসে এসেছে—

'দুআ ইবাদতের মগজ এবং মূল জিনিস।'

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'আল্লাহ তাআলার কাছে দুআর চাইতে বেশী মর্যাদাবান আর কিছু নেই।'

আর এ জন্যই আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, যে স্বীয় প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চায় না। এ ব্যাপারে একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—

'আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হন যে নিজের প্রয়োজনসমূহ তাঁর কাছে চায় না।'

সুবহানাল্লাহ! কী আশ্চর্য ব্যাপার! দুনিয়াতে যদি কোন ব্যক্তি তার একান্ত বন্ধু বা রক্ত সম্পর্কের নিকটাত্মীয়ের কাছে কোন প্রয়োজনে বারবার চায়, তখন তো সে বিরক্ত হয়ে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি এতই দয়ালু যে, তিনি না চাইলে অসন্তুষ্ট হন আর চাইলে খুশি হন।

অন্য এক হাদীসে এসেছে—

'যে ব্যক্তির জন্য দুআর দরজা খুলে গিয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যাকে দুআ করার তাওফীক দান করেছেন এবং আসল দুআ করার ভাগ্য যার জুটেছে) তার জন্য আল্লাহর রহমতের দরজা খুলে গিয়েছে।'

মোটকথা, কোন প্রয়োজনে বা উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ

করা যেমন সেটা অর্জন করার একটি তদবীর, তেমনি তা উচ্চ পর্যায়ের একটি ইবাদতও বটে। এতে আল্লাহ তাআলা খুব খুশী হন। ফলে তিনি বান্দার প্রতি তাঁর রহমতের দরজা খুলে দেন। এ অবস্থা প্রত্যেক দুআর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। চাই তা দ্বীনী কোন উদ্দেশ্যে করা হোক বা কোন পার্থিব প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে হোক। কিন্তু শর্ত হল যে, অবৈধ কোন কার্যসিদ্ধির জন্য তা করা যাবে না। অবৈধ উদ্দেশ্যে দুআ করাও অবৈধ এবং গুনাহের কাজ।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, দুআ অন্তরের যত গভীর আবেগ নিয়ে করা হবে, নিজেকে যত দুর্বল ও অসহায় ভেবে করা হবে, আল্লাহ তাআলার প্রতি যত দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে করা হবে, ততই তা কবুল হওয়ার আশা করা যাবে। যে দুআ আন্তরিকতার সাথে করা হবে না, শুধু রেওয়াজ মাফিক মুখস্ত বুলি আওড়ানো হল, এটা মূলত দুআই নয়। হাদীস শরীফে এসেছে—

'আল্লাহ তাআলা ঐ দুআ কবুল করেন না যা অন্যমনস্কচিত্তে করা হয়।'

যদিও আল্লাহ তাআলা সবসময়ই বান্দার দুআ শোনেন, কিন্তু হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, বিশেষ বিশেষ কিছুসময় আছে যখন দুআ বেশী কবুল হয়। যেমন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর, রাতের শেষভাগে, রমযান মাসে ইফতারীর সময়, কোন সৎকাজ সম্পাদনের পর, সফরে থাকাকালীন, বিশেষ করে সফর যদি কোন দ্বীনী সফর হয়, আর তা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য হয়—এসব অবস্থায় দুআ কবুলের কথা বর্ণিত হয়েছে।

দুআ কবুল হওয়ার জন্য 'মানুষ আল্লাহর ওলী হতে হবে' এ শর্ত নয়। যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্যলাভকারী ওলী বান্দাদের দুআ বেশী কবুল হয়ে থাকে। তাই বলে গুনাহগার বান্দাদের দুআ শোনাই হয় না, ব্যাপারটা এমন নয়। সুতরাং কেউ যেন নিজেকে গুনাহগার মনে করে দুআ ছেড়ে দিয়ে বসে না থাকে। আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত দয়ালু, পরম করুণাময় সত্তা, তিনি তার গুনাহগার বান্দাদেরকে যেভাবে আহার দান করেন, তেমনি তাদের দুআও

শোনেন। এজন্য সবাইকেই মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করা উচিত। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে দুআও একটি ইবাদত। সুতরাং দুআ কবুল হোক বা না হোক তার জন্য সওয়াব তো অবশ্যই পাওয়া যাবে।

বারবার দুআর পরও যদি উদ্দেশ্য হাসিল না হয়, তবুও নিরাশ হয়ে দুআ ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা দেখেন না, তিনি বান্দার মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখে দুআ কবুল করেন। বান্দা যা চেয়েছে তা বান্দার মঙ্গলের দিকে খেয়াল রেখে আল্লাহ তাআলা কখনো দেরী করেও দান করে থাকেন। কিন্তু বান্দা তো তা জানে না। এজন্য সে যা চায় তা তাড়াতাড়িই কামনা করে, আর আল্লাহ মনস্থ করেছেন দেরীতে দিবেন, ফলে বান্দা নিরাশ হয়ে দুআই ছেড়ে দেয়। মোটকথা বান্দার উচিত, নিজের প্রয়োজন, নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দুআ চালিয়ে যাবে। কেউ জানেনা যে, আল্লাহ তাআলা কখন, কোন্ মুহূর্তে তার দুআ কবুল করে নিবেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআর ব্যাপারে ইরশাদ করেন—

'দুআ কখনো বিফলে যায় না, কিন্তু তা কবুল হওয়ার বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে। কখনো এমন হয় যে, আল্লাহ তাআলা বান্দা যা চেয়েছে তা তাকে দেয়া ভাল মনে করছেন না। এজন্য তা সে পাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু এর পরিবর্তে তাকে অন্য কোন ভাল জিনিস দিয়ে দেয়া হয়। অথবা ঐ দুআর কারণে তার উপর ধাবমান বিপদাপদ দূর করে দেয়া হয়। অথবা তার ঐ দুআকে গুনাহের কাফফারা বানিয়ে দেয়া হয়। (কিন্তু বান্দা তো এই ভেদ জানে না, তাই সে মনে করে যে, আমার দুআ বুঝি বেকার গেল।) আবার কখনো এমনও হয় যে, আল্লাহ তাআলা দুআকে পরকালের জন্য সঞ্চিত রাখেন। অর্থাৎ বান্দা যে উদ্দেশ্যে দুআ করে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে তা তাকে দান করেন না। কিন্তু তার ঐ দুআর বিনিময়ে পরকালের জন্য অনেক বেশী সওয়াব তার জন্য লিখে দেন।'

হাদীস শরীফে এসেছে—

'অনেক লোকের দুআ দুনিয়াতে কবুল হয়নি, তারা পরকালে

নিজেদের কৃত দুআসমূহের বিনিময় স্বরূপ প্রাপ্ত সওয়াব ও পুরস্কারের ভাণ্ডার দেখে আফসোস করে বলতে থাকবে ঃ হায়! যদি দুনিয়াতে কোন দুআই কবুল না করা হতো আর সবগুলোর বিনিময় আমরা এখানে পেতাম!'

মোটকথা, ঈমানদার প্রত্যেক বান্দাকে মহান আল্লাহ তাআলার প্রতি তাঁর অসীম কুদরত ও তাঁর দয়ার গুণের দৃঢ় বিশ্বাস রেখে কবুল হওয়ার পূর্ণ আশা ও ভরসার সাথে নিজের প্রত্যেক প্রয়োজনের জন্য তাঁর কাছে দুআ করা উচিত। আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, দুআ কখনো বিফলে যায় না। যতদূর সম্ভব দুআতে এমন সব শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা উচিত, যদ্দ্বারা নিজের অপারগতা ও অসহায়ত্ব এবং আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ব প্রকাশ পায়। কুরআন শরীফে আমাদেরকে অনেক দুআ শেখানো হয়েছে। তাছাড়া হাদীসের মধ্যেও অগণিত দুআ বর্ণিত হয়েছে। কুরআন হাদীসের এসব দুআই সর্বোত্তম দুআ। তন্মধ্যে সংক্ষিপ্ত চল্লিশটি সর্বব্যাপী দুআ গ্রন্থের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

সবক ঃ ১৯

দরূদ শরীফ

দরূদ শরীফও আসলে একটি দুআ। আমরা আল্লাহর বান্দা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করি। আল্লাহ তাআলার পর আমাদের প্রতি সবচেয়ে বেশী অবদান রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই রয়েছে। তিনি কঠিন থেকে কঠিনতর দুঃখ–কষ্ট সহ্য করে আল্লাহ তাআলার হিদায়াত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছেন। তিনি যদি আল্লাহর রাহে এ কষ্ট না করতেন, তবে ধর্মের এ আলোকিত পথের সন্ধান আমরা পেতাম না। আমরা কুফর আর শিরকের গহীন অরণ্যে ঘুরপাক খেতে থাকতাম। আর মৃত্যুর পর দোযখ হতো আমাদের ঠিকানা।

আমরা তাঁর ঋণ শোধ করতে পারব না কোন ভাবেই। আমরা যা করতে পারব, তাহল, মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে তাঁর জন্য দুআ করা, এ দিয়েই আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। আমাদের পক্ষ থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের উপযুক্ত দুআ এটাই হতে পারে যে, 'হে আল্লাহ! আপনি আপনার নবীকে বিশেষ রহমত এবং বরকত দ্বারা মহিমান্বিত করুন এবং তার মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে দিন।' এ ধরনের দুআকেই দরূদ বলে। কুরআন শরীফে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এবং আশ্চর্য ভঙ্গিতে আমাদেরকে দরূদ পাঠের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইরশাদে ইলাহী—

إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا
عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

অর্থাৎ, 'আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা রহমত প্রেরণ করেন তাঁর নবীর প্রতি। হে ঈমানদারেরা! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ এবং সালাম প্রেরণ কর।'

এ আয়াতের প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁর নবীকে সম্মান করেন আর তাঁর প্রতি দয়া ও রহমত প্রদর্শন করেন। ফেরেশতারাও তাঁর সাথে সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করেন এবং আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য রহমতের দুআ করেন। অতঃপর আমরা ঈমানদারদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরাও তাঁর জন্য মহান আল্লাহর দরবারে রহমত বর্ষণের প্রার্থনা কর। তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর। নির্দেশ দেয়ার আগেই আমাদেরকে যেন জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, তিনি আল্লাহ তাআলার প্রিয়তম বান্দা, তাঁর জন্য দুআ করাকে ফেরেশতারাও নিজেদের জন্য গৌরবের বিষয় মনে করে এ কাজে ব্যস্ত থাকেন, এটা জানার পর কোন্ মুসলমান এমন আছে যে, তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করাকে নিজের জন্য গৌরবের বিষয় ভাববে না?

দরূদ শরীফের ফযীলত ও মর্যাদা প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তা থেকে এখানে কয়েকটি সন্নিবেশিত করা হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত হাদীস। তিনি ইরশাদ করেন—

> 'যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ প্রেরণ করে, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন।'

অন্য এক বর্ণনায় এর সাথে এটাও বলা হয়েছে—

> 'তাঁর দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং দশটি মর্যাদার ধাপ উত্তীর্ণ করে দেয়া হয়।'

আরেকটি হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

> 'আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে একদল ফেরেশতা নিয়োগ করে রেখেছেন, যাদের কাজই হচ্ছে, আমার যে উম্মত আমার প্রতি দরূদ-সালাম প্রেরণ করে, তাঁরা তার দরূদ ও সালাম আমার কাছে পৌছে দেবে।'

সুবহানাল্লাহ! কত সৌভাগ্যের ব্যাপার, আমাদের দরূদ ও সালাম ফেরেশতাদের মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পৌছানো হয়। আর এ অসীলায় তাঁর দরবারে আমাদের মত নগণ্যের আলোচনা হয়।

'কি যে ভাগ্য আমার
আল্লাহু আকবার!'

অন্য এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'কিয়ামত দিবসে ঐ ব্যক্তি আমার সবচাইতে নিকটবর্তী হবে, যে বেশী বেশী আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করত।'

আরেকটি হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বড় কৃপণ, যার সামনে আমার নাম নেয়া হল, আর সে তখন আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করল না।'

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

'ঐ ব্যক্তির মুখে চুনকালি লাগুক, যার সামনে আমার আলোচনা হল, আর সে দরূদ প্রেরণ করল না।'

মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ-সালাম প্রেরণ করা আমাদের একটি বড় কর্তব্য; এটা আমাদের নিজেদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। ইহকাল-পরকালে আমাদের প্রতি অসংখ্য-অগণিত রহমত-বরকতের বারি বর্ষিত হওয়ার একটি মহামূল্যবান মাধ্যম।

দরূদের বাক্য ঃ

কোন কোন সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ আমরা হুযূরের প্রতি দরূদ কিভাবে প্রেরণ করব? তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে 'দরূদে ইবরাহীমী' শিক্ষা দিলেন, যা নামাযে পাঠ করা হয়, 'নামায অধ্যায়ে' তা অতিবাহিত হয়েছে। এমনই আরেকটি সংক্ষিপ্ত দরূদ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসে তার বাক্যগুলো নিম্নরূপ—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

'হে আমার আল্লাহ! উম্মী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তার পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি, যারা হলেন মুমিন জননী। এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ কর, যেভাবে তুমি ইবরাহীম (আঃ)এর পরিবারবর্গের প্রতি রহমত বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি তো প্রশংসার যোগ্য, তুমি তো মহামহীম।'

যখনই আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক উচ্চারণ করব, তাঁর আলোচনা করব বা অন্যের থেকে শুনব, তখনই তাঁর প্রতি দরূপ পাঠ করব। এমন সময় শুধু এটুকুই বললে চলবে—

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

প্রতিদিনকার ওযীফা ঃ

কোন কোন আল্লাহওয়ালা দৈনিক হাজার হাজার বার দরূদ পাঠ করার রুটিন পালন করে থাকেন। কিন্তু আমাদের মত দুর্বল ঈমানদারেরা যদি সকাল-সন্ধ্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে শুধু একশত বার করে দরূদ পাঠ করতে থাকি, তবুও আমরা এমন মূল্যবান অনেক কিছু লাভ করতে পারব, পাঠকারীর প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতো দয়ার্দ্র হবেন যে, দুনিয়াতে কেউ তা কল্পনাও করতে পারবে না। যারা সংক্ষিপ্ত দরূদ পাঠ করতে আগ্রহী, তারা নিম্নলিখিত ছোট্ট দরূদখানা মুখস্ত করে নিন—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اٰلِهٖ.

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! উম্মী নবী হযরত মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি এবং তার পরিবারবর্গের প্রতি রহমত বর্ষণ কর।'

সবক ঃ ২০

তাওবা-ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী-রাসূল ও ঐশীগ্রন্থ এজন্য মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন যে, মানুষ যেন ভাল-মন্দ গুনাহ-সওয়াবের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। মন্দ কাজ ও গুনাহ থেকে যেন বাঁচতে পারে। ভাল এবং সওয়াবের পথে চলে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালীন জীবনে মুক্তি অর্জন করতে পারে।

যারা নবী-রাসূল এবং তাঁদের কাছে অবতীর্ণ ঐশীগ্রন্থকে মান্য করেনি, এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তাদের জীবন তো একেবারেই খোদাদ্রোহী ও পাপ পঙ্কিল জীবন। আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হিদায়াত বা সৎপথের দিশার ব্যাপারে তারা বিলকুল সম্পর্কহীন। এজন্য যতক্ষণ তারা আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণের প্রতি, তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ ঐশীগ্রন্থের প্রতি, বিশেষ করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ সর্বশেষ মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের উপর ঈমান না আনবে এবং তাঁর দেখানো পথে না চলবে, ততক্ষণ তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালীন মুক্তি অর্জন করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ, তাঁর প্রিয় নবী ও ঐশীগ্রন্থের অস্বীকার এমন অপরাধ, যা ক্ষমার অযোগ্য। আল্লাহর প্রত্যেক নবী-রাসূল যার যার যুগে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা নিয়ে এসেছেন। মোটকথা কুফর ও শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিদের মুক্তির পূর্বশর্ত হল তারা প্রথমে কুফর ও শিরক থেকে তাওবা করবে এবং ঈমান ও একত্ববাদকে জীবন সংস্কৃতির ভিত্তি বানাবে। এছাড়া মুক্তি আশা করা সম্ভব নয়।

যারা নবী-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের বাতানো পথে চলার অঙ্গিকার করে ফেলে, তারাও কখনো কখনো শয়তানের ধোকায় পড়ে বা প্রবৃত্তির তাড়নায় গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এমন সব লোকদের জন্য আল্লাহ তাআলা তাওবা-ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার দরজা খুলে রেখেছেন।

তাওবা–ইস্তিগফারের অর্থ হল, যখন বান্দা থেকে কোন নাফরমানী বা গুনাহের কাজ হয়ে যায়, তখন সাথে সাথে কৃত গুনাহের ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে যাবে, তার ভেতরে অনুশোচনা সৃষ্টি হবে এবং ভবিষ্যতে আর এমন গুনাহে লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলার দরবারে কৃত গুনাহের জন্য ক্ষমা চাইবে। কুরআন হাদীসে বলা হয়েছে যে, শুধু এটুকু করলেই আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তার পাপ মোচন করে দেন। মনে রাখতে হবে, তাওবা শুধু মুখে করলে হবে না। কৃত গুনাহের ব্যাপারে অন্তরে আফসোস, ব্যথা এবং লজ্জার উদ্রেক হতে হবে, সামনে আর এমন গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প নিবে, তবেই তা হবে তাওবা।

তাওবার উদাহরণ একেবারে এমন, যে কোন ব্যক্তি রাগে বা কোন দুঃখ–কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার জন্য বিষ খেয়ে ফেলল, আর যখন ঐ বিষের প্রতিক্রিয়ায় নাড়িভুড়িতে ব্যথা শুরু হল এবং ভীষণ কষ্ট অনুভব করতে লাগল, তখন নিজের ভুলের জন্য আফসোস করতে লাগল। চিকিৎসার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। ডাক্তাররা যে ওষুধই তাকে দিল, তা–ই সে সেবন করতে লাগল। ঠিক এ সময় তার অন্তরে দৃঢ় সিদ্ধান্ত এটাই হবে যে, আমি যদি জীবিত থাকি, তবে সামনে কখনো আর এমন বোকামী করব না।

গুনাহগারের অন্তরের অবস্থাও এমন হওয়া উচিত। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি এবং পরকালীন শাস্তির কথা ভেবে নিজের কৃত গুনাহের ব্যাপারে অনুশোচনা করবে। আর ভবিষ্যতের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে যে, আজ থেকে আর কখনো এমন করব না। আর যা হয়ে গিয়েছে তার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

যদি আল্লাহ তাআলা কাউকে গুনাহের ব্যাপারে এমন করার সৌভাগ্য দান করেন, তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এই তাওবার ফলে গুনাহের সমূহ প্রভাব একেবারেই মুছে গিয়েছে। আর আল্লাহ তাআলার রহমতের দরজা খুলে গিয়েছে। এমন তাওবার পর গুনাহগার গুনাহের সমূহ প্রভাব থেকে একদম পবিত্র হয়ে যায়। এমনকি ঐ তাওবাকারী বান্দা গুনাহপূর্ব সময়ের তুলনায় তাওবা পরবর্তী সময়ে আল্লাহর কাছে

বেশী প্রিয় হয়ে যায়। কখনো কখনো তো গুনাহের পর প্রকৃত তাওবার বদৌলতে বান্দা এমন উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যায়, যা হাজার বছর ইবাদত ও সাধনার পরও অর্জন করা সম্ভব হয় না।

এতক্ষণ যা বলা হল সবই কুরআন-হাদীসের সারাংশ। এখন তাওবা-ইস্তিগফার সংক্রান্ত কুরআন-হাদীসের কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হচ্ছে।

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.

'হে ঈমানদারেরা! তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রকৃত তাওবা কর। আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতিপালক (এই তাওবার পর) তোমাদের গুনাহসমূহ মার্জনা করে দেবেন আর তোমাদেরকে বেহেশতের ঐসব বাগ-বাগিচায় প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে।' (সূরা তাহরীম)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

أَفَلَا يَتُوْبُوْنَ إِلَى اللّٰهِ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَهُ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

'তারা কেন আল্লাহর কাছে তাওবা করে না আর কেন ক্ষমা প্রার্থনা করে না, অথচ আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু।' (সূরা মায়েদাহ)

সূরা আনফালে কি ভালবাসা মিশ্রিত ইরশাদ—

وَ إِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

'আর হে নবী! যখন তোমার কাছে আমার আয়াতের প্রতি

ঈমানদারেরা আসবে. তখন তুমি তাদেরকে বল যে, তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হোক, তোমাদের প্রতিপালক নিজ সত্তার জন্য 'রহমত করা' নির্ধারণ করে রেখেছেন। তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ গুনাহ করে ফেলে, অতঃপর তওবা করে নেয় এবং নিজে বিশুদ্ধ হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তো অতীব ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।' (সূরা আনআম)

মহান আল্লাহ তাআলার দয়াময় সত্তায় আমরা উৎসর্গিত! তিনি আমাদের মত গুনাহগারদের জন্য তাওবার দ্বার উন্মুক্ত রেখে আমাদের মুক্তির পথ সুগম করে রেখেছেন। নতুবা কোথায় যে আমাদের ঠিকানা হতো!

এ কয়েকখানা আয়াতের পর এখন তাওবা সম্পর্কিত কয়েকখানা হাদীস উপস্থাপন করছি। মুসলিম শরীফে দীর্ঘ একখানা 'হাদীসে কুদসী' বর্ণিত হয়েছে। তার অংশবিশেষ হল—

'আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাত-দিন কত ভুলভ্রান্তি করে থাক, আর আমি সব গুনাহ মাফ করে দিতে পারি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব।'

একটি হাদীসে এসেছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'আল্লাহ তাআলা প্রতি রাতে তাঁর দয়া ও ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন। যেন দিনের গুনাহগার তাওবা করে নেয়। আবার দিনেও হাত বাড়ান, যেন রাতের গুনাহগারেরা তাওবা করে নেয়। আর আল্লাহর এ কাজটি সেদিন পর্যন্ত চলতে থাকবে, কিয়ামতের অতি নিকটবর্তী সময়ে যেদিন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে।'

অন্য একখানা হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'আল্লাহর এক বান্দা গুনাহ করে ফেলেছে, অতঃপর আল্লাহ তাআলার দরবারে হাত উত্তোলন করে বলল ঃ হে আমার প্রভু!

আমি তো গুনাহ করে ফেলেছি। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ আমার বান্দা জানে যে, তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি গুনাহের দরুন পাকড়াও করতে পারেন, আর ক্ষমাও করে দিতে পারেন। অতঃপর আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। এরপর আল্লাহ্ যতদিন চান সে গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে। কিছুদিন পর আবার সে গুনাহ্ করে বসল। আবার আল্লাহর দরবারে হাত পেতে বলল ঃ হে আমার মালিক ! আমার থেকে তো গুনাহ হয়ে গিয়েছে, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আবার আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ আমার বান্দা জানে যে, তার একজন মালিক আছে, যিনি গুনাহসমূহ মাফ করে থাকেন এবং শাস্তিও দিতে পারেন। আমি আমার বান্দার গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ যতদিন চান বান্দা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। কিছুদিন পর আবার কোন গুনাহ্ করে বসল। আবার আল্লাহ তাআলার দরবারে হাত পেতে বলল ঃ হে আমার মাওলা ! আমার থেকে তো গুনাহ হয়ে গিয়েছে। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ তাআলা আবার ইরশাদ করেন ঃ আমার বান্দার বিশ্বাস আছে যে, তাঁর একজন মালিক ও মাওলা আছেন, যিনি গুনাহ মাফও করতে পারেন আবার এর জন্য শাস্তিও দিতে পারেন। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম।'

আরেকটি হাদীসে এসেছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'গুনাহ থেকে তাওবাকারী বান্দা ঐ ব্যক্তির মত হয়ে যায়, যে ঐ গুনাহ করেইনি।'

এসব হাদীসে মহান আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও দয়ার মহিমান্বিত গুণাবলীর কথা ফুটে উঠেছে। কিন্তু সাবধান ! এসব হাদীস শুনে গুনাহের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে যাওয়া এবং তাওবা ও মাগফিরাতের উপর ভরসা করে গুনাহ্ করতে থাকা মুমিনের কাজ নয়। রহমত ও মাগফিরাতের এসব আয়াত ও হাদীস শুনে আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালবাসা আরো গাঢ় হওয়া উচিত। আর এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত

যে, এমন মহান দয়ালু প্রভুর অবাধ্যতা তো নিমকহারামী ছাড়া আর কিছু নয়। একটু ভেবে দেখা উচিত যে, যদি কোন চাকরের মনিব তার সাথে খুবই নরম ও সহানুভূতিশীল আচরণ করে, তবে কি ঐ চাকরের জন্য বেপরোয়াভাবে তার অবাধ্যতা করে যাওয়া উচিত?

মূলত এসব আয়াত ও হাদীসের উদ্দেশ্য তো শুধু এটাই যে, কোন মুমিন বান্দা থেকে যদি অনিচ্ছাকৃত কোন গুনাহ হয়ে যায় তবে যেন সে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে যায়। বরং তাওবা করে ঐ গুনাহের দাগ দিল থেকে মুছে ফেলবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর দয়াগুণে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রাগ না হয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। একটি হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

> 'বান্দা যখন গুনাহ করে আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে যায় আর আন্তরিকভাবে তাওবা করে নেয়, তখন আল্লাহ তাআলা তার তাওবার দরুন তার প্রতি ঐ বান্দার চেয়ে বেশী খুশী হয়ে যান, যার বাহনের প্রাণী কোন বিজন মাঠে তার হাত থেকে ছুটে পালিয়ে গেল, আর ঐ প্রাণীর পিঠেই তার খাবার-দাবারের সমূহ আসবাবপত্র বোঝাই ছিল। এখন সে একেবারে নিরাশ হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় কোন গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। ঠিক তখন হঠাৎ সে দেখতে পেল যে, তার হারানো ঐ বাহনসমূহ আসবাবপত্র সহ দাঁড়িয়ে আছে। সে গিয়ে ওটাকে ধরে ফেলল। অতঃপর অব্যক্ত আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল ঃ হে আল্লাহ! আসলেই তুমি আমার বান্দা, আর আমি তোমার প্রতিপালক! [১] নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন যে, এ ব্যক্তি তার হারানো প্রাণীটি পেয়ে যে পরিমাণ খুশী হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর গুনাহগার বান্দার তাওবা করা দেখে এর চাইতেও বেশী খুশী হন।'

---

১. অত্যধিক খুশীর ফলে তার মুখ থেকে আসলে যা বলতে চেয়েছিল তার উল্টোটা বেরিয়ে গেল।

এসব আয়াত ও হাদীস জেনেও যে ব্যক্তি তার গুনাহ থেকে তাওবা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর রহমত লাভে সক্ষম না হবে, নিঃসন্দেহে সে ভীষণ বঞ্চিত এবং দুর্ভাগা।

অনেক লোক এই মনে করে তাওবা তাড়াতাড়ি করে না যে, এখন তো আমরা জোয়ান রয়েছি, বুড়ো হয়ে যাওয়ার পর মৃত্যুর আগে আগে কোন এক সময় তাওবা করে নেব। কিন্তু ভাইয়েরা ! এটা আমাদের প্রতি শয়তানের একটি বড় ধোঁকা। সে যেভাবে স্বয়ং আল্লাহর রহমত থেকে দূর হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে গেছে, তার মত আমাদেরকেও তার সাথী বানাতে চায়। কেউ জানে না যে, তার মৃত্যু কখন আসবে। সুতরাং প্রতিদিনকে জীবনের শেষ দিন মনে কর। আর যখনই কোন গুনাহ হয়ে যায়, তখন সাথে সাথেই তাওবা করে নাও। এটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কুরআন শরীফে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে—

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولٰئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّيْ تُبْتُ الْئٰنَ وَ لَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا.

'শুধু ঐসব লোকদের তাওবা কবুল করা আল্লাহর যিম্মায় রয়েছে, যারা অজান্তে গুনাহ করে ফেলে আর যথাশীঘ্র তাওবা করে নেয়। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদের তাওবা কবুল করে নেন। আর আল্লাহ তাআলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। আর ঐসব লোকের তাওবা তো তাওবাই নয়, যারা (নির্দ্বিধায়) অহরহ গুনাহর কাজ করে যেতে থাকে, এমনকি যখন মৃত্যু তাদের একদম সামনে এসে দাঁড়ায় তখন সে বলে যে, এখন আমি তাওবা করছি। (এদের তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়) আর যারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাওবাও কবুল করা হবে না। এসব লোকদের জন্য আমি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির

ব্যবস্থা করে রেখেছি।' (সূরা নিসা)

সুতরাং যে সময়টুকু বাকী আছে এটাকে আমরা অতিমূল্যবান মনে করি। নিজের অবস্থার সংশোধন করতে এবং তাওবা করতে দেরী করব না। নাজানি কখন মৃত্যু এসে যায়। আর তখন তাওবা করার সুযোগ এবং তাওফীক হবে কি হবে না তাও তো ঠিক নেই।

ভাইয়েরা! আমরা আমাদের জীবনে কত মানুষকে মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে দেখেছি। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা হল, যারা যেভাবে জীবনযাপন করেছে, সে সেভাবেই মৃত্যুবরণ করেছে। অর্থাৎ এমন সাধারণত হতে দেখা যায় না যে, এক ব্যক্তি সারাটা জীবন আল্লাহকে ভুলে কাটিয়েছে, তাঁর অবাধ্যতার মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করেছে, আর মৃত্যুর একদিন পূর্বে তাওবা করে ব্যাস আল্লাহর ওলী হয়ে গিয়েছে! সুতরাং যে ব্যক্তি চায় যে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে তার জন্য জরুরী হল, সে পুরো জীবনটাই আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় অতিবাহিত করবে। তাহলে আশা করা যায় যে, তার জীবনের শেষ মুহূর্তটাও আল্লাহর সন্তুষ্টিতেই কাটবে। তার মৃত্যু হবে সৌভাগ্যময় এক মিলনসেতু। আর কিয়ামতের দিন সৌভাগ্যবান বান্দাদের সাথেই তার হাশর বা পুনরুত্থান হবে।

তাওবা সংক্রান্ত একটি জরুরী কথা ঃ

বান্দা যদি কোন গুনাহ থেকে তাওবা করে, পরে যদি আবার সে ঐ গুনাহ করে বসে, তবুও সে যেন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়। বরং সাথে সাথে আবার তাওবা করে ফেলবে। আবার যদি তাওবা ভেঙ্গে যায়, আবার তাওবা করবে। এভাবে শত-সহস্র বারও যদি তার তাওবা ভেঙ্গে যায়, তারপরও নিরাশ হয়ে বসে থাকবে না, যখনই সে আন্তরিকভাবে তাওবা করবে, মহান আল্লাহ তাআলার ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তার তাওবা কবুল করবেন। আর তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ তাআলার দয়ার সাগরের কোন কূল কিনারা নেই, তার রহমত অসীম ও সুপ্রশস্ত।

কী বলে তাওবা ও ইস্তিগফার করতে হবে?

তাওবা ও ইস্তিগফারের মর্মার্থ এতক্ষণ বলা হল। তা থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বান্দা যে কোন ভাষায়, যে কোন বাক্য ব্যবহার করে তাওবা করলে এবং ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে আল্লাহ তাআলা শোনেন এবং তা কবুল করেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে তাওবা ও ইস্তিগফারের কিছু বিশেষ বিশেষ বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সেগুলো পড়তেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে এসব বাক্য খুবই বরকতপূর্ণ, আল্লাহর কাছে অতিপ্রিয় এবং এ দ্বারা তাওবা কবুল হওয়ার অত্যধিক আশা করা যায়। তন্মধ্যে কিছু এখানে সন্নিবেশন করা হল। এগুলো মুখস্ত করে তাওবা ও ইস্তিগফার করা উচিত।

(১)

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ.

'আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ঐ আল্লাহর কাছে, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর সত্তা, আর আমি তার কাছে তওবা করছি।'

হাদীস শরীফে এসেছে—

'যে ব্যক্তি উক্ত বাক্য দ্বারা তাওবা ও ইস্তিগফার করবে, আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে ভেগে যাওয়ার গুনাহ করে ফেলে, যা আল্লাহর কাছে অনেক বড় একটি গুনাহ।'

অন্য এক হাদীসে এসেছে—

'যে ব্যক্তি রাতে শয়নকালে তিনবার এ বাক্য দ্বারা তাওবা ও ইস্তিগফার করবে, আল্লাহ তাআলা তার সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ হয়।'

(২)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো শুধু (أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ) অর্থাৎ আমি আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি—বলে

ইস্তিগফার করতেন। এটা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি ইস্তিগফার। এটা সব সময় পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

৩

সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার (সেরা ইস্তিগফার) ঃ

হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার হল—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ اَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَ اَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তুমি আমার সৃষ্টিকর্তা, আর আমি তোমার গোলাম। যথাসম্ভব আমি তোমার সাথে কৃত অঙ্গিকার ও ওয়াদার উপর দৃঢ়পদ রয়েছি। আমি যেসব খারাপ কাজ করেছি, এর অনিষ্টতা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার দেয়া পুরস্কারসমূহকে স্বীকার করছি আর কৃত গুনাহও স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া ক্ষমাকারী আর কেউ নেই।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যে বান্দা এ বাক্যের মাধ্যমে এর মর্মার্থের দিকে খেয়াল রেখে বিশ্বাসের সাথে দিনের বেলায় আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, সে যদি ঐ দিন রাতের পূর্বে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে বেহেশতী হয়ে যাবে। আর যদি এভাবে রাতের বেলায় ক্ষমা প্রার্থনা করে আর সকাল হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে বেহেশতী হবে।'

এখানে শুধু এ তিনটি বাক্য সন্নিবেশিত হল। এগুলো মুখস্ত করে নেয়া খুব কঠিন কোন কাজ নয়। হাদীস শরীফে এসেছে—

'ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ ও মুবারকবাদ! যার আমলনামাতে বেশী বেশী তাওবা ও ইস্তিগফার উল্লেখিত থাকবে।'

অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'যে ব্যক্তি ইস্তিগফারকে দৃঢ়ভাবে ধরবে (অর্থাৎ সবসময় গুনাহ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে) আল্লাহ তাআলা তাকে প্রত্যেক মুসীবত থেকে মুক্তি দেবেন। তার সব চিন্তা-পেরেশানী দূর করে দেবেন। আর তাকে (অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে) এমনভাবে জীবিকা দান করবেন, যার কোন কল্পনাই সে করত না।'

পরিশিষ্ট

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করার সংক্ষিপ্ত সিলেবাস ঃ

এ ছোট্ট বইয়ের বিশটি সবকে যা কিছু বলা হয়েছে, এটা আমল করলেই জান্নাত লাভ করার জন্য ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট হবে। মন চাইছে যে, পরিশেষে একটি সারাংশ উপস্থাপন করি।

ইসলামের সর্বপ্রথম শিক্ষা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত লাভ করার প্রথম শর্ত হল—

মানুষ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। তারপর প্রয়োজন মোতাবেক ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। আর ফরয-ওয়াজিব, সুন্নত-মুস্তাহাব এবং বান্দার হক (অধিকার), আদব-কায়দা, আখলাক-চরিত্রের ব্যাপারে ইসলামের যে শিক্ষা ও বিধি-বিধান রয়েছে, তার অনুসরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবে। যখনই কোন ভুল-ত্রুটি বা গুনাহ হয়ে যাবে, সাথে সাথে আন্তরিকভাবে তাওবা করবে, ক্ষমা প্রার্থনা করবে। সামনে ভাল হয়ে চলার দৃঢ় সংকল্প করবে। আর যদি আল্লাহর কোন বান্দার সাথে কোন ধরনের ভুল-ত্রুটি বা অন্যায় হয়ে যায়, তবে তার কাছে মাফ চেয়ে নিবে। বা বিনিময় প্রদান করে নিজেকে বাঁচাবে।

তেমনি চেষ্টা করবে, যেন দুনিয়ার সবকিছু থেকে আল্লাহ, তাঁর প্রিয় রাসূল ও তাঁর ধর্মের প্রতি বেশী ভালবাসা হবে। সদা-সর্বদা ধর্মের উপর অটল-অবিচল থাকবে। এ ধর্মের দাওয়াত ও খিদমতের ব্যাপারে অংশ নিবে। এটা বড়ই সৌভাগ্যের ব্যাপার। এটা নবী-রাসূলদের কাজ। এটাই তাঁদের উত্তরাধিকার। বিশেষ করে আজকালকার যুগে এর মর্যাদা অন্যসব নফল ইবাদত থেকে অনেক গুণ বেশী। এর বরকতে নিজের সম্পর্ক দ্বীনের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বাড়তে থাকবে।

নফল ইবাদতের মধ্যে সম্ভব হলে তাহাজ্জুদ নামাযের অভ্যাস গড়ে তুলবে। এর বরকত অপরিসীম। সবধরনের গুনাহ বিশেষ করে কবীরাহ গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। যেমন, চুরি-ডাকাতি, জেনা-ব্যভিচার,

মিথ্যা, মদ্যপান, আচার–ব্যবহার ও লেনদেনে সততাহানী ইত্যাদি।

দৈনন্দিন কিছু যিকিরেরও রুটিন ঠিক করে নেয়া উচিত। সময় বেশী না থাকলেও কমপক্ষে সকাল–সন্ধ্যায়—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ.

একশত বার করে, অথবা শুধু سبحان الله و بحمده এবং ইস্তিগফার–দরূদ শরীফ একশত বার করে পাঠ করবে।

কুরআন তিলাওয়াতেরও দৈনিক কিছু অংশ রুটিন করে নিবে। পূর্ণ ভক্তি–শ্রদ্ধার সাথে পাঠ করবে। প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এবং শয়নকালে 'তাসবীহে ফাতিমী' অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পাঠ করতে থাকবে। যদি কেউ এর চাইতে বেশী কিছু করতে চায়, তবে কোন ওলী আল্লাহর কাছে গিয়ে তার পরামর্শ নিয়ে চলবে। শেষ কথা হল, আল্লাহওয়ালা বান্দাদের সাহচর্য এবং তাদের সাথে ভালবাসার বন্ধন তৈরী করে তাদের সান্নিধ্য লাভ করা এ পথের কার্যকরী এক পন্থা। এটা যদি ভাগ্যে জুটে যায় তবে বাকী সবই আপনা–আপনি নিজের মধ্যে এসে যাবে। আল্লাহ তাআলা সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন !

প্রতিদিন পাঠ করার মতো
কুরআন ও হাদীসের চল্লিশটি দুআ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّيْنَ. امين

'সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। অত্যন্ত দয়ালু এবং পরম করুণাময়। কিয়ামত দিবসের মালিক। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমারই সাহায্য চাই। তুমি আমাদেরকে সহজ সরল পথে পরিচালিত কর। তাদের পথে যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ। তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব পতিত হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে।'

১

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহ-পরকালের কল্যাণ দান করুন আর দোযখের শাস্তি থেকে আমাদেরকে পরিত্রাণ দান করুন।'

২

رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

'হে আল্লাহ! আমরা ঈমান আনলাম, সুতরাং তুমি আমাদের সমূহ গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং দোযখের শাস্তি থেকে আমাদেরকে বাঁচাও।'

৩

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِىْ أَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

'হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও। আর আমাদের কাজকর্মে যেসব বাড়াবাড়ি হয়েছে, সেগুলো ক্ষমা করে দাও। আর সত্যের উপর আমাদেরকে দৃঢ়পদ করে দাও এবং কাফির গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।'

৪

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا. رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ.

'হে আমাদের প্রভু! এক ঘোষণাকারী থেকে ঈমানের ঘোষণা দিতে শুনেছি। (যে, হে লোকসকল! তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন) ফলে আমরা ঈমান নিয়ে এসেছি। সুতরাং হে আমাদের প্রভু! আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও, আমাদের অন্যায়গুলোকে মুছে দাও এবং তোমার পুণ্যবান বান্দাদের সাথে আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাও।'

৫

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَ عَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

'হে আল্লাহ! তুমি তোমার রসূলগণের মাধ্যমে যা কিছু দান করার ওয়াদা করেছ, তার সবকিছু আমাদেরকে দান কর। আর কিয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমান করো না। নিশ্চয় তোমার ওয়াদা ভঙ্গ হয় না।'

৬

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার অবাধ্য হয়ে নিজেরাই নিজেদের উপর অনেক জুলুম করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'

(৭)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ وَ نَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

'হে প্রভু আমাদের! তুমি আমাদেরকে অত্যাচারী জাতির অত্যাচারের শিকার বানিও না। আর তুমি নিজ দয়াগুণে আমাদেরকে কাফির জাতির জুলুম অত্যাচার থেকে মুক্তি দাও।'

(৮)

فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ.

'হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! ইহকাল ও পরকালে শুধু তুমিই আমার সাহায্যকারী, ইসলামের উপর আমার মৃত্যু দাও। আর তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।'

(৯)

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ . رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার বংশধরকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের দুআ কবুল কর। কিয়ামতের দিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সকল মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিন।'

(১০)

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا.

'হে পরওয়ারদিগার! আমার পিতামাতার প্রতি দয়া কর। যেভাবে তাঁরা আমাকে আমার শৈশবে আদর করে লালনপালন করেছেন।'

(১১)

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

'হে আল্লাহ! আমার (দ্বীনী) জ্ঞান বাড়িয়ে দাও এবং (তাতে বরকত দান কর।')

(১২)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّحِمِيْنَ.

'পরওয়ারদিগার! তুমি ক্ষমা করে দাও এবং দয়া কর। তুমি তো উত্তম দয়াশীল।'

(১৩)

رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَ عَلٰى وَالِدَىَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

'আমার প্রভু! তুমি আমার এবং আমার পিতামাতাকে যে নিয়ামত দান করেছ তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সৌভাগ্য দান কর এবং যেন এমন আমল করি যদ্দ্বারা তুমি সন্তুষ্ট হও। আর আমার জন্য আমার পরিবার পরিজনদের মধ্যে আত্মসংশোধনী দান কর, আমি তোমার দরবারে তাওবা করছি, আর আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।'

(১৪)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ

قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ.

'প্রভু হে! আমাদেরকে এবং আমাদের ঈমানদার পূবসূরীদেরকে ক্ষমা করে দাও। আর ঈমানদারদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ থেকে আমাদের অন্তরকে পরিস্কার রাখ। হে আল্লাহ! তুমি বড়ই দয়ালু, করুণাময়।'

(১৫)

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ اغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٍ.

'হে পরওয়ারদিগার! আমাদের জন্য নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও। আর আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয় তুমি সর্বশক্তিমান।'

(১৬)

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ شَانِىْ كُلَّهٗ.

'হে চিরঞ্জীব ও সকলের পরিচালক! তোমার রহমতের ভরসায় আমার প্রার্থনা ঃ তুমি আমার সার্বিক অবস্থা ভাল করে দাও।'

(১৭)

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ وَ اَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ وَ اَصْلِحْ لِىْ اٰخِرَتِىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ وَ اجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً لِّىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَ اجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

'হে আল্লাহ! আমার দ্বীনকে ঠিক করে দাও, যদ্দ্বারা এই সবকিছু। আর আমার দুনিয়াকে ঠিক করে দাও, যাতে আমার জীবিকার উপকরণ রয়েছে এবং আমার পরকাল ঠিক করে দাও, যেখানে আমাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে আর চিরদিন থাকতে হবে। আমার জীবনকে উন্নতির পথে প্রত্যেক উত্তম জিনিসের মাধ্যম বানাও। এবং মৃত্যুকে প্রত্যেক মন্দ থেকে মুক্তির মাধ্যম বানাও।'

(১৮)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ.

'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি কামনা করছি।'

(১৯)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَ التُّقٰى وَ الْعَفَافَ وَ الْغِنٰى.

'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হিদায়াত, তাকওয়া, বেহায়াপনা থেকে মুক্তি এবং পরমুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বেঁচে থাকার প্রার্থনা করছি।'

(২০)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا وَ عِلْمًا نَافِعًا وَ عَمَلًا مُّتَقَبَّلًا.

'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পবিত্র জীবিকা, উপকারী দ্বীনী জ্ঞান এবং মাকবুল আমলের প্রার্থনা করছি।'

(২১)

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لَنَا اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ سَهِّلْ لَنَا اَبْوَابَ رِزْقِكَ.

'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য তোমার রহমতের দ্বারসমূহ খুলে দাও এবং আমাদের জন্য জীবিকার দ্বারসমূহ সহজ করে দাও।'

(২২)

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِیْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ اغْنِنِیْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

'হে আল্লাহ! তোমার হালাল বস্তুসামগ্রীকে আমার জন্য যথেষ্ট কর। আর হারাম থেকে আমাকে হেফাজত কর। এবং তুমি ছাড়া আর সকলের ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী কর।'

(২৩)

اَللّٰهُمَّ وَ فِّقْنِىْ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى وَاجْعَلْ اُخْرَتِىْ خَيْرًا مِّنَ الْاُوْلٰى.

'হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় ও পছন্দনীয় বিষয়ের তাওফীক দান কর এবং পরকালকে ইহকালের তুলনায় ভাল করে দাও।'

(২৪)

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِىْ رُشْدِىْ وَ قِنِىْ شَرَّ نَفْسِىْ.

'হে আল্লাহ! কল্যাণ এবং হিদায়াত আমার অন্তরে ঢেলে দাও। আর নফস বা প্রবৃত্তির অনিষ্টতা থেকে আমাকে হেফাজত কর।'

(২৫)

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ.

'হে আল্লাহ! তোমার যিকির, শুকর এবং উত্তম ইবাদতের ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য কর।'

(২৬)

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ.

'হে অন্তর পরিবর্তনকারী খোদা! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর এবং প্রতিষ্ঠিত রাখ।'

(২৭)

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مُسْلِمًا وَّ اَمِتْنِىْ مُسْلِمًا.

'হে আল্লাহ! আমাকে ইসলামের সাথে জীবিত রাখ এবং মুসলমান হিসেবে আমাকে মৃত্যু দাও।'

(২৮)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَ حُبَّ عَمَلٍ يُّقَرِّبُ اِلٰى حُبِّكَ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِىْ وَ مِنْ اَهْلِىْ وَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.

'হে আল্লাহ! আমাকে তোমার ভালবাসা দান কর। তোমার যে বান্দা তোমাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা দান কর, যে আমল আমাকে তোমার ভালবাসার নিকটবর্তী করে তা দান কর। হে আল্লাহ! তোমার ভালবাসা আমার কাছে আমার প্রাণ, পরিবার পরিজন এবং ঠাণ্ডা পানি থেকে বেশী প্রিয় করে দাও।'

(২৯)

اَللّٰهُمَّ غَشِّنِىْ بِرَحْمَتِكَ وَ جَنِّبْنِىْ عَذَابَكَ.

'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার রহমত দ্বারা ঢেকে নাও। আর তোমার শাস্তি থেকে মুক্তি দান কর।'

(৩০)

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَىَّ يَوْمَ تَزِلُّ فِيْهِ الْاَقْدَامُ.

'হে আমার আল্লাহ! যেদিন লোকেদের পা কাঁপতে থাকবে ঐদিন তুমি আমাকে দৃঢ়পদ রাখ।'

(৩১)

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا.

'হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমার হিসাব–কিতাবকে সহজ করো।'

(৩২)

رَبِّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ.

'হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও।'

(৩৩)

اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

'হে আল্লাহ! হাশরের দিন তুমি আমাকে তোমার শাস্তি থেকে মুক্তি দাও।'

(৩৪)

اَللّٰهُمَّ اِنَّ مَغْفِرَتَكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِىْ وَ رَحْمَتِكَ اَرْجى عِنْدِىْ مِنْ عَمَلِىْ.

'হে আল্লাহ! তোমার দয়া আমার গুনাহর তুলনায় অনেক প্রশস্ত। আর আমার আমলের তুলনায় তোমার রহমতের আশাই বেশী করি।'

(৩৫)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ و الْجَنَّةَ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ.

'আমি তোমার কাছে তোমার সন্তুষ্টি এবং জান্নাত কামনা করছি। আর তোমার অসন্তুষ্টি এবং দোযখ থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি।'

(৩৬)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لا اُحْصِىْ ثَنَاء عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

'হে আল্লাহ! আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে সন্তুষ্টির আশ্রয় চাচ্ছি। আর তোমার শাস্তি থেকে তোমার ক্ষমার আশ্রয় চাচ্ছি। তোমার পাকড়াও থেকে তোমার কাছেই আশ্রয় চাচ্ছি। হে খোদা! তোমার গুণাগুণ বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটুকই বলি, তুমি তেমনই, যেমন তুমি নিজের ব্যাপারে বর্ণনা করেছ।'

(৩৭)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

'হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করুন। আমার প্রতি দয়া করুন। আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি বড় অনুগ্রহশীল এবং দয়ালু।'

(৩৮)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ اَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ

بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَ اَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

'হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমারই বান্দা। যথাসম্ভব আমি তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গিকারে দৃঢ় থেকেছি। হে আমার মালিক! আমি আমার মন্দ কাজসমূহ থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি তোমার দেয়া পুরস্কারসমূহ স্বীকার করছি। আর আমার গুনাহসমূহের স্বীকারোক্তি করছি। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও। তুমি ছাড়া তো গুনাহ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই।'

(৩৯)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَ مِنْ شَرِّ بَصَرِىْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِىْ وَ مِنْ شَرِّ قَلْبِىْ وَ مِنْ شَرِّ مَنِيِّىْ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِوَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ.

'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি আমার কানের অনিষ্টতা থেকে, চোখের অনিষ্টতা থেকে, জিহ্বার অনিষ্টতা থেকে, অন্তরের অনিষ্টতা থেকে, প্রবৃত্তির অনিষ্টতা থেকে। তোমার আশ্রয় চাচ্ছি দোযখের শাস্তি থেকে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে, তোমার কাছে আরো আশ্রয় চাচ্ছি জীবন ও মৃত্যুর সব ফিতনা থেকে।'

(৪০)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ) وَ عُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ)

'হে আল্লাহ!আমি আপনার ঐ সকল কল্যাণ কামনা করছি, যে সকল কল্যাণ আপনার নিকট আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেয়েছেন। আর আমি ঐ সকল মন্দ জিনিস ও মন্দ জিনিসের অনিষ্টতা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, যে সকল মন্দ জিনিস ও মন্দ জিনিসের অনিষ্টতা থেকে আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় চেয়েছেন।'

(৪১)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ اَبْلِغْهُ الْوَسِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِىْ وَ عَدْتَّهٗ.

'হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁর পরিবার–পরিজনদের প্রতি রহমত নাযিল কর। যেভাবে তুমি হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর প্রতি ও তার পরিবার–পরিজনদের প্রতি নাযিল করেছিলে। হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ও তার পরিবার–পরিজনদের প্রতি বরকত নাযিল কর, যেভাবে তুমি হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর পরিবার–পরিজনদের প্রতি বরকত নাযিল করেছিলে। তুমিই প্রশংসার যোগ্য মর্যাদাশীল। হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন তুমি তাকে নৈকট্যের আসনে সমাসীন কর এবং 'ওসীলা' ও উচ্চ মর্যাদায় পৌছে দাও। আর ঐ 'মাকামে মাহমূদ' (প্রশংসিত স্থান) তাঁকে দান কর, যার ওয়াদা তুমি তার জন্য করেছ।'

বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ দুআ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক দুআ বিশেষ বিশেষ সময়ে পাঠ করার শিক্ষা দিয়েছেন। তন্মধ্যে প্রতিদিন পাঠ করার কিছু দুআ আছে। এগুলো এখানে সন্নিবেশন করা হল। আল্লাহ যদি তাওফীক দান করেন তবে এগুলোকে মুখস্ত করে সময়ত পাঠ করার অভ্যাস বানিয়ে নেয়া উচিত।

(১)

সকাল হলে পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَ بِكَ اَمْسَيْنَا وَ بِكَ نَحْيٰى وَ بِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! তোমার হুকুমে আমরা সকালে উপনীত হলাম আর তোমার হুকুমে সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমার হুকুমে জীবিত আছি। তোমার হুকুমে মৃত্যুবরণ করব। আর তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করব।'

(২)

সন্ধ্যা হলে পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَ بِكَ اَصْبَحْنَا وَ بِكَ نَحْيٰى وَ بِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! তোমার হুকুমেই আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হলাম। তোমার হুকুমেই সকালে উপনীত হই। তোমার হুকুমে জীবিত থাকি, তোমার হুকুমেই মৃত্যুবরণ করি। তারপর তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করব।'

৩

শয়নকালে পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَ اَحْيٰى.

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরতে চাই এবং জীবিত হতে চাই।'

৪

ঘুম থেকে জাগ্রত হলে পাঠ করবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانِىْ بَعْدَ مَا اَمَاتَنِىْ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

অর্থ ঃ 'মহান আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া, যিনি আমাকে মৃত্যুর পর জীবিত করলেন, আর তার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'

৫

ইস্তিঞ্জায় (শৌচাগার) যাবার সময় পাঠ করবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ.

অর্থ ঃ 'আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুষ্ট শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।'

৬

শৌচাগার থেকে বের হয়ে পাঠ করবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَ عَافَانِىْ.

অর্থ ঃ 'ঐ আল্লাহ তাআলার শোকর, যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক জিনিস (ময়লা) দূর করে দিয়েছেন। আর আমাকে শান্তি দিয়েছেন।'

৭

উযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করবে। আর উযূর মধ্যখানে এ দুআ পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَ وَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ.

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করে দাও। আমার জন্য আমার ঘর প্রশস্ত করে দাও। আর আমার কামাই–রুজিতে বরকত দান কর।'

৮

উযূ শেষ করে পাঠ করবে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ اجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

অর্থ ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা এবং তাঁর রসূল। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তাওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও।'

৯

মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা ভিতরে রেখে এ দুআ পাঠ করবে ঃ

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আর আমার জন্য (পরকালীন) রহমতের দ্বারসমূহ খুলে দাও।'

১০

খানার শুরুতে পাঠ করবে ঃ بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ.

অর্থ ঃ 'আল্লাহর নাম ও তাঁর বরকতের সাথে। (শুরু করছি)'

(১১)

খানার শেষে পাঠ করবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ ঃ 'মহান আল্লাহ তাআলার শোকর, যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন পান করালেন, আর আমাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।'

(১২)

কারো বাড়ীতে দাওয়াত খেয়ে শেষে এ দুআ পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ.

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! যিনি আমাকে খানা পরিবেশন করলেন, তুমি তাকে খাওয়াও। যিনি আমাকে পান করালেন, তুমি তাকে পান করাও।'

(১৩)

যানবাহনে আরোহণ কালে এ দুআ পাঠ করবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

অর্থ ঃ 'আল্লাহ তাআলার শোকর, ঐ সত্তা পবিত্র, যিনি এ বাহনকে আমার আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন। আমরা এটাকে আমাদের আয়ত্বাধীন করতে পারতাম না, আমরা একদিন আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করব।'

(১৪)

সফরের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দুআ পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا هٰذَا السَّفَرَ وَاَطْوِعَنَّا بُعْدَهٗ. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَ الْخَلِيْفَةَ فِى الْاَهْلِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ

وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَ الْاَهْلِ وَ الْوَلَدِ.

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ সফরকে আসান করে দাও। এর দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই আমার সফরের একমাত্র সাথী। আমার অনুপস্থিতিতে তুমিই আমার পরিবারবর্গের দেখাশুনাকারী। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি—সফরের কষ্ট থেকে, মন্দ অবস্থা থেকে এবং ফিরে এসে সম্পদ ও পরিবার পরিজনকে মন্দ অবস্থায় পাওয়া থেকে।'

(১৫)

সফর থেকে ফেরার সময় পাঠ করবে ঃ

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

অর্থ ঃ 'আমরা সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী।'

(১৬)

অন্য কাউকে ঘর থেকে বিদায় জানানোর সময় পাঠ করবে ঃ

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَ اَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكَ.

অর্থ ঃ 'আমি তোমার দ্বীন, হেফাজত উপযুক্ত জিনিসপত্র এবং তোমার আমলের পরিণতি আল্লাহ তাআলার হাতে সোপর্দ করছি।'

(১৭)

কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে এ দুআ পাঠ করবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَ فَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا.

'ঐ আল্লাহ তাআলার শোকর, যিনি আমাকে তোমার মত বিপদে পতিত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে সুস্থ রেখেছেন। আর তিনি তাঁর অনেক সৃষ্টি

থেকে আমাকে মর্যাদাশীল করেছেন। (এটা একমাত্র তাঁরই দান, এতে আমার কোন হাত নেই)'

(১৮)

কোন শহরে বা জনপদে প্রবেশ কালে পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا.

'হে আল্লাহ! এ জনপদে আমাদের জন্য বরকত দান কর আর এটাকে বরকতময় কর।'

(১৯)

যখন কোন বৈঠক শেষ করে উঠবে তখন এ দুআ পড়বে ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ.

'হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার প্রশংসা করছি। তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার কাছে গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাওবা করছি।'

॥ ॥ ॥ ॥

অনেক ভাইয়েরা আসল আরবী বাক্য স্মরণ রাখতে পারেন না। তারা বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন দুআসমূহের মর্মার্থ মনে রেখে, সেটাই যথাসময়ে মনে মনে বললে ইনশাআল্লাহ দুআর পূর্ণ সওয়াব এবং বরকত লাভ করতে পারবেন।

একটি দরখাস্ত

পাঠক ভাইয়েরা! আপনারা যারাই যখন এ কিতাব পাঠ করবেন এবং এসব দুআসমূহ পাঠ করবেন তখন আপনাদের দুআয় আমি গুনাহগার (লেখক হযরত)কেও স্মরণ করে আমার জন্য, আমার পিতামাতার জন্য, পরিবারবর্গের জন্য এবং অন্যান্য ভাই-বন্ধুদের জন্য গুনাহ মাফের এবং রহমতের দুআ করে কৃতার্থ করবেন। এটা আমার প্রতি আপনাদের পক্ষ থেকে অনেক বড় পুরস্কার বিবেচিত হবে।

আমি দুআ করি আল্লাহ তাআলা আপনাদের এ পুরস্কারের উত্তম প্রতিদান দান করেন।[১]

অধম বান্দা—
মুহাম্মাদ মনযুর নু'মানী
রজব, ১৩৬৯ হি:

১. এক্ষেত্রে আমি অধম অনুবাদক মাহদী হাসানও বিদগ্ধ আলিমে দ্বীন, কাফেলায়ে দারুল উলূম দেওবন্দের তৎকালীন সমাদৃত মুখপাত্র হযরত মাওলানা মনযুর নুমানী (রহ:)-এর দরখাস্তের সাথে নিজেকে শামিল করে সকল পাঠকবৃন্দের খেদমতে দুআর দরখাস্ত রাখছি। আল্লাহ তাআলা যেন আমার এ তুচ্ছ কাজটিকে আমার জন্য, পরিবারবর্গ এবং উম্মতে মুসলিমার জন্য নাজাতের